বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

ভাদ্র, ১৩৫২

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস, ২৭।৩ বি হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পিতৃদেবের
শ্রীচরণে

নিবেদন

বর্তমান নিবন্ধে আমি বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদের গোড়ার কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য, আমার দৃষ্টি ঐতিহাসিকের, এবং ঐতিহাসিক বিচার ও যুক্তি-পদ্ধতি অনুযায়ী যে-সব সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রাহ্য আমি যথাসম্ভব তাহাই ব্যবহার করিয়াছি। বিষয়টি জটিল, উচ্চতর বর্ণসমাজে আচরিত এবং প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাস ইহাকে জটিলতর করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী ঐতিহাসিক সত্য অবিকৃতভাবে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি এই বিশ্বাসে যে, আমার দেশবাসী স্বচ্ছ ও নির্মোহ দৃষ্টি লইয়া এই জটিল সমস্যাটি বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। ইতি শ্রাবণ ১৩৫২

নীহাররঞ্জন রায়

বর্ণাশ্রম প্রথার জন্মের ইতিহাস আলোচনা না করিয়াও বলা যাইতে পারে, বর্ণবিন্যাস ভারতীয় সমাজ-বিন্যাসের ভিত্তি। খাওয়া-দাওয়া এবং বিবাহ ব্যাপারের বিধিনিষেধের উপর ভিত্তি করিয়া আর্যপূর্ব ভারতবর্ষের যে সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন ছিল তাহাকে পিতৃপ্রধান আর্যসমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ঢালিয়া সাজাইয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছিল। এই নূতন করিয়া গড়ার পশ্চাতে একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক যুক্তি কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সে-সব আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। যে-যুগে বাংলা দেশের ইতিহাসের সূচনা সে-যুগে বর্ণাশ্রম আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতীয় সমাজের উচ্চতর এবং অধিকতর প্রভাবশালী শ্রেণীগুলিতে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং ধীরে ধীরে তাহা পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইতেছে। বর্ণাশ্রমের এই সামাজিক আদর্শের বিস্তারের কথাই এক হিসাবে ভারতবর্ষে আর্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বিস্তারের ইতিহাস, কারণ ঐ আদর্শের ভিতরই ঐতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের সংস্কার ও সংস্কৃতির সকল অর্থ নিহিত। বর্ণাশ্রমই আর্য-সমাজের ভিত্তি, শুধু ব্রাহ্মণ্য সমাজেরই নয়, জৈন এবং বৌদ্ধ সমাজেরও। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আর্যপূর্ব ও অনার্য সংস্কার এবং সংস্কৃতি এই বর্ণাশ্রমের কাঠামো এবং আদর্শের মধ্যেই সমন্বিত ও সমীকৃত হইয়াছে। বস্তুত, বর্ণাশ্রমগত সমাজ-বিন্যাস এক হিসাবে যেমন ভারতে-তিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তেমনই অন্য দিকে এমন সর্বব্যাপী এমন সর্বগ্রাসী এবং গভীর অর্থবহ সমাজ-ব্যবস্থাও পৃথিবীর আর কোথাও

দেখা যায় না। প্রাচীন বাংলার সমাজ-বিন্যাসের কথা বলিতে গিয়া সেইজন্য বর্ণবিন্যাসের কথা বলিতেই হয়।

বর্ণাশ্রম প্রথা ও অভ্যাস যুক্তিপদ্ধতিবদ্ধ করিয়াছিলেন প্রাচীন ধর্মসূত্র ও স্মৃতিগ্রন্থের লেখকেরা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর মধ্যে তাঁহারা সমস্ত ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চাতুর্বর্ণ্য প্রথা অলীক উপন্যাস, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কারণ ভারতবর্ষে এই চতুর্বর্ণ্যের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোম ছিল, প্রত্যেক বর্ণ, জন ও কোমের ভিতর আবার ছিল অসংখ্য স্তর উপস্তর। ধর্মসূত্র ও স্মৃতিকারেরা নানা অভিনব অবাস্তব উপায়ে এই সব বিচিত্র বর্ণ, জন ও কোমের স্তর-উপস্তর ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতে এবং সব-কিছুকেই আদি চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর যুক্তিপদ্ধতিতে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন পর্যন্ত এই চেষ্টার কখনও বিরাম হয় নাই। একথা অবশ্যস্বীকার্য যে স্মৃতিকারদের রচনার মধ্যে সমসাময়িক বাস্তব সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন আছে, সেই অবস্থার ব্যাখ্যার একটা চেষ্টা আছে; কিন্তু যে-যুক্তিপদ্ধতির আশ্রয়ে তাহা করা হইয়াছে অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্যের বহির্ভূত অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোমের নরনারীর সঙ্গে চাতুর্বর্ণ্যভুক্ত নর-নারীর যৌনমিলনের ফলে সমাজের যে বিচিত্র বর্ণ ও উপবর্ণের, বিচিত্রতর সংকর বর্ণের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা একান্তই অনৈতিহাসিক এবং সেই হেতু অলীক। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হয় আয়ব্রাহ্মণ্য ভারতীয় সমাজ আজও এই যুক্তিপদ্ধতিতে বিশ্বাসী, এবং সুদূর প্রাচীন কাল হইতে আদি চাতুর্বর্ণ্যের যে কাঠামো ও যুক্তিপদ্ধতি অনুযায়ী বর্ণব্যাখ্যা হইয়া আসিয়াছে সেই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করিয়া হিন্দুসমাজ আজও বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ ও সংকর বর্ণের সামাজিক স্থান নির্ণয়

করিয়া থাকেন। বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই, আজও হইতেছে না।

এই সব বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ, সংকর বর্ণ সকল কালে ও ভারতবর্ষের সকল স্থানে এক প্রকারের ছিল না, এখনও নয়; সকল স্মৃতিশাস্ত্রে সেইজন্য এক প্রকারের বিবরণও পাওয়া যায় না। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থগুলির একটিও বাংলাদেশে রচিত নয়; কাজেই বাংলার বর্ণবিন্যাসগত সামাজিক অবস্থার পরিচয়ও তাহাতে পাওয়া যায় না, আশা করাও অযৌক্তিক এবং অনৈতিহাসিক। বস্তুত, একাদশ শতকের আগে বাংলাদেশে বাংলা-দেশের সামাজিক প্রতিফলন লইয়া একটিও স্মৃতিগ্রন্থ বা এমন কোনও গ্রন্থ রচিত হয় নাই যাহার ভিতর সমসাময়িক কালের বর্ণবিন্যাসের ছবি কিছুমাত্র ধরা যাইতে পারে। বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বীকার করিলে বলিতেই হয়, এই সময় হইতেই বাঙালী স্মৃতি ও পুরাণকারেরা সজ্ঞানে ও সচেতন ভাবে বাংলার সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রাচীনতর ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির আদর্শ ও যুক্তিপদ্ধতি অনুযায়ী ভারতীয় বর্ণবিন্যাসের কাঠামোর মধ্যে বাঁধিবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। কিন্তু এই সজ্ঞান সচেতন চেষ্টার আগেই, বহুদিন হইতেই, আর্যপ্রবাহ বাংলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে; এবং আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণাশ্রমের যুক্তি এবং আদর্শও স্বীকৃতি লাভ করে। সেইজন্য প্রাচীন বাংলার বর্ণবিন্যাসের কথা বলিতে হইলে বাংলার আর্যী-করণের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা আরম্ভ করিতে হয়।

উপাদান-বিচার

আর্যীকরণের তথা বাংলার বর্ণবিন্যাসের প্রথম পর্বের ইতিহাস নানা সাহিত্যগত উপাদানের ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। সে-উপাদান রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মনু-বৌধায়ন প্রভৃতি স্মৃতি ও

সূত্রকারদের গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বৌদ্ধ ও জৈন প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও এ-সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য নিহিত আছে। উত্তরবঙ্গে এবং বাংলা-দেশের অন্যত্র গুপ্তাধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আর্যীকরণ তথা বাংলার বর্ণবিন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বর্ণবিন্যাস-ইতিহাসের প্রচুর উপাদান বাংলার অসংখ্য লিপিমালায় বিদ্যমান। বস্তুত, সন-তারিখ-যুক্ত এই লিপিগুলির মত বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরযোগ্য যথার্থ বাস্তব উপাদান আর কিছু হইতেই পারে না; এইগুলির উপর নির্ভর করিয়াই বাংলার বর্ণবিন্যাসের ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারে, এবং তাহা করাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। বর্তমান নিবন্ধে আমি তাহাই করিতে চেষ্টা করিব। সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক দু-একটি কাব্যগ্রন্থের, যেমন রামচরিতের সাহায্যও লওয়া যাইতে পারে। ইহাদের ঐতিহাসিকতা অবশ্যস্বীকার্য।

তবে, সেন-বর্মণ আমলে বাংলাদেশে প্রচুর স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সেগুলি কখন কোন্ রাজার আমলে ও পোষকতায় কে রচনা করিয়াছিলেন তাহা সুনির্ধারিত ও সুবিদিত। সমস্ত স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থ কালের হাত এড়াইয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই; অনেক গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া অথবা হারাইয়া গিয়াছে। কিছু কিছু যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ভবদেব ভট্টের ও জীমূতবাহনের কয়েকটি গ্রন্থই প্রধান। এই সব স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে কোনও বাধা নাই; এবং লিপি-মালায় যে-সব তথ্য পাওয়া যায়, সে-সব তথ্য এই স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিলে অনৈতিহাসিক বা অযৌক্তিক কিছু করা হইবে না।

স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থ ছাড়া অন্তত দুইটি অবাচীন পুরাণ-গ্রন্থ বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গোপালভট্ট-আনন্দভট্টকৃত বল্লালচরিত, এবং বাংলার কুলজী গ্রন্থমালায় হিন্দুযুগের শেষ অধ্যায়ের বর্ণবিন্যাসের ছবি কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের একটিকেও সমসাময়িক সাক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সেইজন্য ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ইহারা কতখানি নির্ভরযোগ্য সে-বিচার আগেই একটু সংক্ষিপ্ত ভাবে করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ

বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের[১] ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিচারালোচনা হইয়াছে।[২] প্রথমোক্ত পুরাণটিতে পদ্মা ও বাংলাদেশের যমুনা নদীর উল্লেখ, গঙ্গার তীর্থমহিমার সবিশেষ উল্লেখ, ব্রাহ্মণের মাছমাংস খাওয়ার বিধান (যাহা ভারতবর্ষের আর কোথাও বিশেষ নাই) ব্রাহ্মণেতর সমস্ত শূদ্রবর্ণের ছত্রিশটি উপ ও সংকর বর্ণে বিভাগ (বাংলার তথাকথিত 'ছত্রিশ জাত' যাহা ভারতবর্ষে আর কোথাও দেখা যায় না) ইত্যাদি দেখিয়া মনে হয় এই পুরাণটির লেখক বাঙালী না হইলেও বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁহার সবিশেষ পরিচয় ছিল। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য

---

১ বৃহদ্ধর্মপুরাণ, Bib. Ind. edn ; বঙ্গবাসী মুদ্রাযন্ত্র প্রকাশিত একটি সংস্করণও বিদ্যমান। উত্তরখণ্ডের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে এবং অন্য খণ্ডের ইতস্তত বর্ণসংবাদ বিক্ষিপ্ত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সং। প্রথমভাগে ব্রহ্মখণ্ডের দশম অধ্যায়ের ১৬-২১ এবং ৯০-১৩৭ শ্লোকে বর্ণবিন্যাস-সংবাদ নিবদ্ধ।

২ ভারতবর্ষ মাসিকপত্র, ১৩৩৬-৩৭, ২য় খণ্ড, ৬৭৩ পৃ., ১৩৩৭ ৩৮, ১ম খণ্ড, ৯৪ পৃ.।

History of Bengal, I., D. U. : pp. 5'7-574, Paul, P. C., Early History of Bengal Vol. II, 59-61.

বর্ণের পৃথক অনুল্লেখ, 'সৎ' ও 'অসৎ' পর্যায়ে শূদ্রদের দুই ভাগ, ব্রাহ্মণদের পরেই অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) এবং করণ (কায়স্থ)দের স্থান নির্ণয়, শংখকার (শাঁখারী), মোদক (ময়রা), তন্তুবায়, দাস (চাষী), কর্মকার, স্বর্ণবণিক ইত্যাদি উপ ও সংকর বর্ণের উল্লেখ প্রভৃতিও এই অনুমানের সমর্থক। বাংলাদেশের বাহিরে অন্যত্র কোথাও এই ধরনের বর্ণব্যবস্থা এবং এই সব সংকর বর্ণ দেখা যায় না। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে; বস্তুত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের বর্ণব্যবস্থার চিত্র প্রায় এক এবং অভিন্ন, এবং তাহা যে বাংলাদেশ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য ইহাও অস্বীকার করা যায় না। এই দুই গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন; তবে এই কাল দ্বাদশ শতকের আগে নয় এবং চতুর্দশ শতকের পরে নয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।[৩] এই অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয়। যদি তাহা হয় তাহা হইলে বলা যায়, এই দুই পুরাণে বাংলার হিন্দুযুগের শেষ অধ্যায়ের বর্ণবিন্যাসের ছবির একটা মোটামুটি কাঠামো পাওয়া যাইতেছে।

বল্লালচরিত

বল্লালচরিত নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রচলিত। একখানির গ্রন্থকার আনন্দভট্ট; নবদ্বীপের রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁর আদেশে তাহার গ্রন্থখানি রচিত হয়। রচনাকাল ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ।[৪] আনন্দভট্টের পিতা দাক্ষিণাত্য-গত ব্রাহ্মণ, নাম অনন্তভট্ট। আর একখানি গ্রন্থ পূর্বখণ্ড, উত্তরখণ্ড ও পরিশিষ্ট এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ডের রচয়িতার নাম গোপালভট্ট, গোপালভট্ট নাকি বল্লালসেনের অন্যতম শিক্ষক

৩ ২নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৪ Vallala-Charita, ed. Haraprasad Sastri, Asiatic Society of Bengal, 1904.

ছিলেন, এবং বল্লালের আদেশানুসারে ১৩০০ শকে নাকি গ্রন্থখানি রচিত হয়। তৃতীয় খণ্ড রাজার ক্রোধোৎপাদনের ভয়ে গোপালভট্ট নিজে লিখিয়া যাইতে পারেন নাই; দুই শত বৎসর পর ১৫০০ শকে আনন্দভট্ট তাহা রচনা করেন।[৫] দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে নানা কুলজীবিবরণ, বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তিকথা ইত্যাদি আছেই, তাহা ছাড়া প্রথম গ্রন্থে বল্লাল কর্তৃক বণিকদের উপর অত্যাচার, সুবর্ণবণিকদের সমাজে 'পতিত' করা এবং কৈবর্ত প্রভৃতি বর্ণের লোকদের উন্নীত করা প্রভৃতি যে-সব কাহিনী বর্ণিত আছে তাহারও পুনঃবিবৃতি আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে বল্লালের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা বল্লালের যথার্থ কাল নয়; কাজেই গোপালভট্ট বল্লালের সমসাময়িক ছিলেন একথাও সত্য নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থটিকে বলিয়াছিলেন 'জাল'; আর শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত প্রথম গ্রন্থটিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন 'জাল'।[৬]

বল্লালচরিতের কাহিনীটি সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখযোগ্য।

সেনরাজ্যে বল্লভানন্দ নামে একজন মস্তবড় ধনী বণিক ছিলেন। উদন্তপুরীর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বল্লালসেন বল্লভানন্দের নিকট হইতে একবার এক কোটি নিষ্ক ধার করেন। বারবার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর বল্লাল আর একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য প্রস্তুত হন, এবং বল্লভানন্দের নিকট হইতে আরও দেড় কোটি সুবর্ণ (মুদ্রা) ধার চাহিয়া পাঠান। বল্লভানন্দ সুবর্ণ পাঠাইতে রাজী হন, কিন্তু তৎপরিবর্তে হরিকেলির রাজস্ব দাবি করেন। বল্লাল ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক বণিকের ধনরত্ন কাড়িয়া লন এবং নানাভাবে তাহাদের উপর অত্যাচার করেন। ইহার পর আবার সৎশূদ্রদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতে তাঁহাদের আপত্তি আছে বলিয়া বণিকেরা রাজপ্রাসাদে এক আহারের আমন্ত্রণ অস্বীকার করে। এই প্রসঙ্গেই বল্লাল

---

৫ Vallala-Charita, ed. by Harischandra Kaviratna, 1889.

৬ Intro. to the English trans. of the Vallalacharita by Haraprasad Sastri, pp. v-vi; Ep. Ind. XV, p. 281; যতীন্দ্রমোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, পৃ. ৪৪৬-৪৭৪।

শুনিতে পান যে বণিকদের নেতা বল্লভানন্দ পালরাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেছেন, এবং মগধের রাজা তাঁহার জামাতা। বল্লাল অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণবণিকদের শূদ্রের স্তরে নামাইয়া দিলেন; তাহাদের পূজা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিলে, তাহাদের কাছ হইতে দান গ্রহণ করিলে কিংবা তাহাদের শিক্ষাদান করিলে ব্রাহ্মণেরাও 'পতিত' হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে এই বিধানও দিয়া দিলেন। বণিকেরা তখন প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্য দিয়া সমস্ত দাসভৃত্যদের হাত করিয়া ফেলিল। উচ্চবর্ণের লোকেরা বিপদে পড়িয়া গেলেন। বল্লাল তখন বাধ্য হইয়া কৈবর্তদিগকে জলচল সমাজে উন্নীত করিয়া দিলেন; তাঁহাদের নেতা মহেশকে মহামাণ্ডলিক পদে উন্নীত করিলেন। মালাকার, কুম্ভকার এবং কর্মকার, ইহারাও সৎশূদ্র পর্যায়ে উন্নীত হইল। সুবর্ণবণিকদের পৈতা পরা নিষিদ্ধ হইয়া গেল; অনেক বণিক দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বল্লাল উচ্চতর বর্ণের মধ্যে সামাজিক বিশৃংখলা দেখিয়া অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে শুদ্ধিযজ্ঞের বিধান দিলেন। ব্যবসায়ী নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্ব একেবারে ঘুচিয়া গেল; তাঁহারা ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে 'পতিত' হইলেন।

কাহিনীটির ঐতিহাসিক যাথার্থ্য স্বীকার করা কঠিন; কিন্তু ইহাকে একেবারে অলীক কল্পনাগত উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া আরও কঠিন। গ্রন্থদুটিকেও 'জাল' বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান নাই। সেনবংশ 'ব্রহ্মক্ষত্র' বংশ; বল্লাল সেন কলিঙ্গরাজ চোড়গঙ্গের বন্ধু ছিলেন (সমসাময়িক তাঁহারা ছিলেনই); বল্লালের সময়ে কীকট-মগধ পালবংশের করায়ত্ত ছিল এবং তাঁহার আমলেই পালবংশের অবসান হইয়াছিল; বল্লাল মিথিলায় সমরাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন—বল্লালচরিতের এই সব তথ্য অন্যান্য স্বতন্ত্র সুবিদিত নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। এই সব হেতু দেখাইয়া কোনও কোনও ঐতিহাসিক যথার্থই বলিয়াছেন, বল্লালচরিত 'জাল' গ্রন্থ নয়, এবং ইহার কাহিনী একেবারে ঔপন্যাসিকও নয়। তাঁহাদের মতে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে প্রচলিত লোক-কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া বল্লালচরিত এবং এই জাতীয় অন্যান্য

গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ; কেহ কেহ ইহাও মনে করেন যে "The *Vallāla-charitā* contains the distorted echo of an internal disruption caused by the partisans of the Pāla dynasty which proved an important factor in the collapse of the Sena rule in Bengal." এই মত সর্বথা নির্ভরযোগ্য।[৭] তবে, এই কাহিনীকে যতটা বিকৃত প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে করা হয় আমি ততটা বিকৃত বলিয়া মনে করি না। আমরা জানি কৈবর্তরা পাল-রাষ্ট্রের প্রতি খুব প্রসন্ন ছিলেন না, একবার তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া এক পালরাজাকে হত্যা করিয়া বরেন্দ্রী বহুদিন তাঁহাদের করায়ত্তে রাখিয়া-ছিলেন। কাজেই সেই কৈবর্তদের প্রসন্ন করা এবং তাঁহাদের হাতে রাখিতে চেষ্টা করা বল্লালের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, বিশেষত মগধের পালদের সঙ্গে শত্রুতা যখন তাঁহাদের ছিলই। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে সেন-রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শের, স্মৃতি ও পুরাণ গ্রন্থাদিতে সমসাময়িক সমাজ-বিন্যাসের যে পরিচয় আমরা পাই তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় সমাজে বণিকদের স্থান খুব শ্লাঘ্য ছিল না। বৃহদ্ধর্মপুরাণে তাঁতী, গন্ধবণিক, কর্মকার, তৌলিক, (সুপারি ব্যবসায়ী), কুমার, শাঁখারী, কাঁসারী, বারজীবী (বারুই), মোদক, মালাকার সকলকে উত্তম সংকর পর্যায়ে গণ্য করা হইয়াছে, অথচ স্বর্ণকার-সুবর্ণ-বণিকেরা ধীবর-রজকের সঙ্গে জল-অচল মধ্যম সংকর পর্যায়ে। ইহার তো কোনও যুক্তিসংগত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বল্লালচরিতে এ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে একটা যুক্তি আছে ; রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে এইরূপ হওয়া খুব বিচিত্র নয়। ইহাকে

---

৭ H B (D.V.), 1, pp. 239-41

একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় কি? সেন-বর্মণ আমলে এইরূপ পর্যায় নির্ণয় যে হইয়াছে স্মৃতিগ্রন্থগুলিই তাহার সাক্ষ্য। লোকস্মৃতি এক্ষেত্রে একেবারে মিথ্যাচরণ করিয়াছে, এমন মনে হইতেছে না। বল্লালচরিত-কাহিনী একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইলেও ইহার মূলে যে একটি ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতেছি না।

কুলজীগ্রন্থমালা

বল্লালচরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছুটা স্বীকার করা গেলেও কুলজীগ্রন্থের ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করা অত্যন্ত কঠিন। বাংলাদেশে কুলজী গ্রন্থমালা সুপরিচিত, সুআলোচিত। ব্রাহ্মণ-কুলজীগ্রন্থমালায় ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলী বা মিশ্রগ্রন্থ, নুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা, বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম, ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপ, মেলপর্যায় গণনা, বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা, কুলার্ণব, হরিমিশ্রের কারিকা, এডু মিশ্রের কারিকা, মহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা এবং সর্বানন্দ মিশ্রের কুলতত্ত্বার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী পঞ্চদশ শতকের রচনা বলিয়া অনুমিত; নুলো পঞ্চানন এবং বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থের কাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতক হইতে পারে। বাকি কুলজীগ্রন্থ সমস্তই অর্বাচীন। বস্তুত, কোন কুলজী গ্রন্থেরই রচনাকাল পঞ্চদশ শতকের আগে নয়; অধিকাংশ কুলজীগ্রন্থ এখনও পাণ্ডুলিপি আকারেই পড়িয়া আছে, এবং নানা উদ্দেশ্যে নানা জনে ইহাদের পাঠ অদলবদলও করিয়াছেন, এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। বৈদ্য-কুলজীগ্রন্থের মধ্যে রামকান্তের কবিকণ্ঠহার এবং ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা সমধিক খ্যাত; ইহাদের রচনাকাল যথাক্রমে ১৬৫৩ ও ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। কায়স্থ এবং অন্যান্য

বর্ণেরও কুলজী ইতিহাস পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি কিছুতেই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের আগেকার রচনা বলিয়া মনে করা যায় না। উনবিংশ শতকের শেষপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া একান্ত আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা দেশের অনেক পণ্ডিত এই সব পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত কুলজী-গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস করিয়াছেন, এবং এখনও অনেক কৌলীন্য মর্যাদাগর্বিত ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ বংশ এই সব কুলজীগ্রন্থের সাক্ষ্যের উপরই নিজেদের বংশমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। বস্তুত, বাংলার কৌলীন্যপ্রথা একমাত্র এই কুলশাস্ত্র বা কুলজীগ্রন্থমালার সাক্ষ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

একান্ত সাম্প্রতিক কালে উচ্চশ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাকে আঘাত করা অত্যন্ত কঠিন। নানা কারণেই ঐতিহাসিকেরা এই সব কুলজীগ্রন্থমালার সাক্ষ্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতিতে আলোচনার বিষয়ীভূত করেন নাই, যদিও অনেকে তাহাদের সন্দেহ ব্যক্ত করিতে দ্বিধা করেন নাই। ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য প্রথম বিচার করেন স্বর্গত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়।[৮] খুব সাম্প্রতিক কালে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই সব কুলজীগ্রন্থের বিস্তৃত ঐতিহাসিক বিচার করিয়াছেন; তাঁহার সুদীর্ঘ বিচারালোচনার যুক্তিবত্তা অবশ্যস্বীকার্য।[৯] কাজেই এখানে একই আলোচনা পুনরুত্থাপন করিয়া লাভ নাই। আমি শুধু মোটামুটি নির্ধারণগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

---

৮ Chanda, R. P., Indo-Aryan Races, Chap. V.

৯ ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকা, ১৩৪৬, কার্তিক—ফাল্গুন, "বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য"; HB (D U.), pp. 623-34

প্রথমত, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে যখন কুলশাস্ত্রগুলি প্রথম রচিত হইতে আরম্ভ করে তখন মুসলমান-পূর্ব যুগের বাংলার সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালীর জ্ঞান ও ধারণা খুব অস্পষ্ট ছিল।[১০] কোনও কোনও পারিবারিক ইতিহাসের অস্তিত্ব হয়ত ছিল, কিন্তু আজ সেগুলির সত্যাসত্য নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। এই সব বংশাবলী এবং প্রচলিত অস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, অর্ধসত্য অর্ধকল্পনার নানা কাহিনীতে সমৃদ্ধ করিয়া এই কুলশাস্ত্রগুলি রচনা করা হইয়াছিল। পরবর্তী কালে এই সব গ্রন্থোক্ত কাহিনী ও বিবরণ বংশ-মর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে পড়িয়া নানা উদ্দেশ্যে নানাভাবে পাঠ-বিকৃতি লাভ করে এবং নূতন নূতন ব্যাখ্যা ও কাহিনীদ্বারা সমৃদ্ধতর হয়। কাজেই ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসাবে ইহাদের উপর নির্ভর করা কঠিন। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে, প্রায় দুই শত আড়াই শত বৎসর মুসলমানাধি-পত্যের পর বর্ণহিন্দুসমাজ নিজের ঘর নূতন করিয়া গুছাইতে আরম্ভ করে, রঘুনন্দন তখনই নূতন স্মৃতিগ্রন্থাদি রচনা করিয়া নূতন সমাজনির্দেশ দান করেন; চারদিকে নূতন আত্মসচেতনার আভাস সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কুল-শাস্ত্রগুলির রচনাও তখনই আরম্ভ হয়, এবং প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রাচীনতর কালের স্মৃতিশাসনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তাহার একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টাও পণ্ডিতদের মধ্যে উদগ্র হইয়া দেখা দেয়। সেন-বর্মণ আমলই স্মৃতিরচনা ও স্মৃতিশাসনের প্রথম স্বর্ণযুগ; কাজেই কুলশাস্ত্রকারেরা সেই যুগের সঙ্গে নিজেদের ব্যবস্থা-ইতিহাস যুক্ত করিবেন তাহাও কিছু আশ্চর্য নয়!

দ্বিতীয়ত, কুলশাস্ত্রকাহিনীর কেন্দ্রে বসিয়া আছেন রাজা আদিশূর।

---

১০ Majumdar, R. C., "An Indigenous History of Bongal," In Proc, of the Ind, Hist. Records Commission, XVI, 59 ff.

আদিশূর কর্তৃক কোলাঞ্চ-কনৌজ (অন্যমতে, কাশী) হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের সঙ্গেই ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ও অন্যান্য কয়েকটি বর্ণ-উপবর্ণের কুলজীকাহিনী এবং কৌলীন্যপ্রথার ইতিহাস জড়িত। কৌলীন্যপ্রথার বিবর্তনের সঙ্গে বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের নামও জড়িত হইয়া আছে, এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলজীর সঙ্গে আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূরের এবং ক্ষিতিশূরের পুত্র ধরাশূরের ; বৈদিক-ব্রাহ্মণ কুলকাহিনীর সঙ্গে বর্মণরাজ শ্যামলবর্মণ এবং হরিবর্মণের নামও জড়িত। একাদশ শতকে দক্ষিণ-রাঢ়ে এক শূরবংশ রাজত্ব করিতেন, এবং রণশূর নামে অন্তত একজন রাজার নাম আমরা জানি। আদিশূর, ক্ষিতিশূর এবং ধরাশূরের নাম আজও ইতিহাসে অজ্ঞাত। সেন ও বর্মণ রাজবংশদ্বয় ত খুবই পরিচিত। কিন্তু আদিশূরই বাংলায় প্রথম ব্রাহ্মণ আনিলেন, তাঁহার আগে ব্রাহ্মণ ছিল না, বেদের চর্চা ছিল না, কুলজীগ্রন্থগুলির এই তথ্য একান্তই অনৈতিহাসিক, অথচ ইহারই উপর সমস্ত কুলজীকাহিনীর নির্ভর। পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা দেশে ব্রাহ্মণের কিছু অভাব ছিল না, বেদ-বেদাঙ্গচর্চাও যথেষ্টই ছিল ; অষ্টম শতকের আগেই বাংলার সর্বত্র অসংখ্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বসবাস হইয়াছিল আর, অষ্টম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অসংখ্য ব্রাহ্মণ যেমন বাংলায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, তেমনই বাংলার ব্রাহ্মণ-কায়স্থেরা বাংলার বাহিরে গিয়াও বিচিত্র সম্মাননা লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গজ ব্রাহ্মণদের কোনও কাহিনী কুলশাস্ত্রগুলিতে নাই, অথচ (পূর্ব)-বঙ্গেও অনেক ব্রাহ্মণ গিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং সম্ভবত বৈদিক ও গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বের খবর অন্যতর স্বতন্ত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতেও পাওয়া যায়। রাঢ়ীয়

ও বারেন্দ্র একান্তই ভৌগোলিক সংজ্ঞা ; বৈদিক ব্রাহ্মণদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আদিশূর-পূর্ব লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান ; আর গ্রহবিপ্রেরা তো বাহির হইতে আগত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়। ইহাদের সম্পর্কে কুলজীর ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক এবং অনৈতিহাসিক। বৈদ্য ও কায়স্থদের ভৌগোলিক বিভাগ সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, অথচ এই দুই রাজার আমলে যে-সব স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, ইহাদের নিজেদের যে-সব লিপি আছে তাহার একটিতেও এই প্রথা সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিতমাত্রও নাই, উল্লেখ ত দূরের কথা; তাহা ছাড়া, এই যুগের ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অসংখ্য অপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের যে-সব উল্লেখ সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও লিপিমালায় পাওয়া যায় তাঁহাদের একজনকেও ভুলেও কুলীন কেহ বলেন নাই। বল্লাল ও লক্ষ্মণের নাম কৌলীন্যপ্রথা উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত থাকিলে তাঁহারা নিজেরা কেহ তাহার উল্লেখ করিলেন না, সমসাময়িক গ্রন্থ ও লিপি-মালায় তাহার উল্লেখ পাওয়া গেল না, ইহা খুবই আশ্চর্য বলিতে হইবে। আদিশূরকাহিনী এবং কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের গাঞী বিভাগও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। গাঞীর উদ্ভব গ্রাম হইতে ; যে গ্রামে যে-ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপন করিতেন তিনি সেই গ্রামের নামানুযায়ী গাঞী পরিচয় গ্রহণ করিতেন। বন্দ্য, ভট্ট, চট্ট প্রভৃতি গ্রামের নামের সঙ্গে উপাধ্যায় বা আচার্য জড়িত হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পদবীর সৃষ্টি। বস্তুতঃ বন্দ্য, ভট্ট, চট্ট ব্রাহ্মণদের এই সব গ্রামনামায় পরিচয় অষ্টম শতক-পূর্ব লিপিগুলিতেই দেখা যাইতেছে। কাজেই এই সব গাঞীপর্যায়-পরিচয় স্বাভাবিক ভৌগোলিক কারণেই উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাহার সূচনা ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই দেখা

গিয়াছিল—আদিশূরকাহিনী বা কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে উহাকে যুক্ত করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। বৈদ্য এবং কোনও কোনও ব্রাহ্মণ কুলজীতে আদিশূর এবং বল্লালসেনকে বলা হইয়াছে বৈদ্য। এ-তথ্য একান্তই অনৈতিহাসিক। সেনেরা নিঃসন্দেহে ব্রহ্মক্ষত্রিয়; ইঁহারা এবং সম্ভবত শূরেরাও অবাঙালী। কাজেই বাঙালী বৈদ্য সংকরবর্ণের সঙ্গে ইঁহাদের যুক্ত করিবার কোনই কারণ নাই।

কুলজীগ্রন্থগুলিতে নানা প্রকার গালগল্প ও বিচিত্র অসংগতি ত আছেই। সাম্প্রতিক পণ্ডিতেরা তাহা সমস্তই অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি শুধু কয়েকটি ঐতিহাসিক যুক্তি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিলাম। এইসব কারণে কুলশাস্ত্রের সাক্ষ্য ঐতিহাসিক আলোচনায় নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। তবে ইহাদের ভিতর দিয়া লোকস্মৃতির একটি ঐতিহাসিক ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করা যায়, এবং সে-ইঙ্গিত অস্বীকার করা কঠিন। পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে যে বর্ণ, উপবর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা, যে-স্মৃতিশাসন বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল তাহার একটা প্রাচীনতর ইতিহাস ছিল, এবং লোকস্মৃতি সেই ইতিহাসকে যুক্ত করিয়াছিল শূর, সেন ও বর্মণ রাজবংশগুলির সঙ্গে—পাল, চন্দ্র বা অন্য কোনও রাজবংশের সঙ্গে নয়, ইহা লক্ষণীয়। আমরা নিঃসংশয়ে জানি সেন ও বর্মণ বংশদ্বয় অবাঙালী; শূরবংশও সম্ভবত অবাঙালী; ইহাও আমরা জানি সেনএবং বর্মণ রাষ্ট্র ও রাজবংশ দুটির ছত্রছায়ায়ই এবং তাঁহাদের আমলেই বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও ব্যবহার-শাসন, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুশাসন সমস্ত পরিবেশ ও বাতাবরণ, সমস্ত খুঁটিনাটি সংস্কার লইয়া সর্বব্যাপী প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কুলজীগ্রন্থগুলির ইঙ্গিতও তাহাই। এই হিসাবে লোকস্মৃতি মিথ্যাচরণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। দ্বিতীয়ত, কোনও কোনও

বংশের প্রাচীনতর ইতিহাস পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়, এবং কুলজীগ্রন্থাদিতে তাহা ব্যবহৃতও হইয়াছে। এই রকম কয়েকটি বংশের সাক্ষ্য স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রমাণদ্বারা সমর্থনও করা যায়।[১১] কুলজীগ্রন্থে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ও গ্রহবিপ্র, ব্রাহ্মণদের এই চারি পর্যায়ের বিভাগও স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রমাণ-দ্বারা সমর্থিত। কুলশাস্ত্রগ্রন্থমালায় ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন শাখার বিচিত্র গাঞী বিভাগের অন্তত কয়েকটি গাঞীর নাম লিপিমালায় এবং সমসাময়িক স্মৃতিসাহিত্য গ্রন্থে পাওয়া যায়।[১২] এইসব কারণে মনে হয়, কুলজীগ্রন্থমালার পশ্চাতে একটা অস্পষ্ট লোকস্মৃতি বিদ্যমান ছিল, এবং এই লোকস্মৃতি একেবারে পুরোপুরি মিথ্যাচারী নয়। তবে, কুলশাস্ত্রগুলির ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটুকু মাত্রই গ্রাহ্য, তাহাদের বিচিত্র খুঁটিনাটি তথ্য ও বিবরণগুলি নয়।

চর্যাগীতি

এই সব ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাদি ছাড়া আর একটি উপাদানের উল্লেখ করিতে হয়; এই উপাদান সহজিয়াতন্ত্রের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি গ্রন্থ, চর্যাচর্য-বিনিশ্চয় বা চর্যাগীতি। এই গ্রন্থ বিভিন্ন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য কর্তৃক গুহ্য তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধীয় সন্ধাভাষায় রচিত কয়েকটি (৫০টি) পদের সমষ্টি। পদ গুলি প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন; ইহাদের তিব্বতী ভাষারূপও কিছুদিন হইল পাওয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, ইহাদের রচনার কাল দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বলিয়া বহুদিন পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত হইয়াছে। এই পদগুলির যত গুহ্য অর্থই থাকুক, কিছু কিছু সমাজ-সংবাদও ইহাদের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে, এবং বিশেষভাবে ডোম, চণ্ডাল

১১ History of Bengal, (D. U.), pp. 630 31, footnotes,

১২ Ibid., pp. 635-37 and footnotes

প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজ পর্যায়ের বর্ণসংবাদ। সমসাময়িক সাক্ষ্য হিসাবে ইহাদের মূল্য অস্বীকার করা যায় না।[১৩]

আর্যীকরণের সূচনা : বর্ণবিন্যাসের প্রথম পর্ব

বাঙালীর ইতিহাসের যে অস্পষ্ট উষাকালের কথা আমরা জানি তাহা হইতে বুঝা যায়, আর্যীকরণের সূচনার আগে এই দেশ অষ্ট্রিক ও দ্রবিড়ভাষাভাষী—অষ্ট্রিক্ ভাষাভাষীই অধিকসংখ্যক,—খুব স্বল্পসংখ্যক অন্যান্য ভাষাভাষী, কৃষি ও শীকারজীবি, গৃহ ও অরণ্যচারী, অসংখ্য কোমে বিভক্ত লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। সাম্প্রতিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় এই তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে যে এইসব অসংখ্য বিচিত্র কোমদের ভিতর বিবাহ ও আহার-বিহারগত ধর্ম ও আচারগত নানাপ্রকার বিধিনিষেধ বিদ্যমান ছিল; এবং এই সব বিধিনিষেধকে কেন্দ্র করিয়া বিচিত্র কোমগুলির পরস্পরের ভিতর যৌন ও আহারবিহার সম্বন্ধগত বিভেদ-প্রাচীরেরও অন্ত ছিল না।[১৪] পরবর্তী আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসের মূল অনেকাংশে এইসব যৌন ও আহার-বিহার সম্বন্ধগত বিধিনিষেধকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা প্রায় অনস্বীকার্য; তবে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতি গুণ ও কর্মকে ভিত্তি করিয়া তাহাদের চিন্তা ও আদর্শানুযায়ী এইসব বিধিনিষেধকে ক্রমে ক্রমে কালানুযায়ী প্রয়োজনে যুক্তি ও পদ্ধতিতে প্রথাশাসনগত করিয়া

---

১৩ বৌদ্ধ গান ও দোঁহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সং, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, Md. Sahidullah Buddhist Mystic Songs; Bagchi, P. C., Materials for a Critical Edition of the Caryapadas; চর্যাপদ, মণীন্দ্রমোহন বসু সং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৪ দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য, Census Report of India, 1931., vol. I part I, Section on Caste.

গড়িয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমাজ ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার নির্ধারণানুযায়ী বিচার করিলে ভারতীয় বর্ণবিন্যাস আর্যপূর্ব ও আর্য্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির সম্মিলিত প্রকাশ। অবশ্যই এই মিলন একদিনে হয় নাই; বহু শতাব্দীর নানা বিরোধ, নানা সংগ্রাম, বিচিত্র মিলন ও আদানপ্রদানের মধ্য দিয়া এই সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে। এই সমন্বয়-কাহিনীই এক হিসাবে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির এবং কতকাংশে ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতিরও ইতিহাস। যাহাই হউক, বাংলা দেশে এই বিরোধ-মিলন-সমন্বয়ের সূচনা কি ভাবে হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু আভাস প্রাচীন আর্য-ব্রাহ্মণ্য ও আর্য-বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই সব গ্রন্থের সাক্ষ্য একপক্ষীয়, এবং তাহাতে পক্ষপাত দোষ নাই এমনও বলা চলে না; আর্যপূর্ব জাতি ও কোমদের পক্ষ হইতে সাক্ষ্য দিবার মতন কোনও অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত নাই। তাহা ছাড়া, বাংলা দেশ উত্তর-ভারতের পূর্বপ্রত্যন্ত দেশ; আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির স্পর্শ ও প্রভাব এদেশকে আক্রমণ করিয়াছে সকলের পরে, তখন তাহা উত্তর-ভারতের আর প্রায় সর্বত্রই বিজয়ী, সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিমান্। অন্যদিকে, তখন সমগ্র বাংলা দেশে আর্যপূর্ব সংস্কার ও সংস্কৃতিসম্পন্ন বিচিত্র কোমদের বাস; তাহারাও কম শক্তিমান নয়। তাহাদের নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতি-বোধ গভীর ও ব্যাপক। কাজেই এইদেশে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বিজয়াভিযান বিনা বিরোধ ও বিনা সংঘর্ষে সম্পন্ন হয় নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই বিরোধ-সংঘর্ষ চলিয়াছিল, ইহা যেমন স্বভাবতই অনুমান করা চলে, তেমনিই ঐতিহাসিক সাক্ষ্য দ্বারাও তাহা সমর্থিত। লিপিপ্রমাণ হইতে মনে হয়, গুপ্ত আমলে আর্য-ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাস, ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি এদেশে সম্যক্ স্বীকৃতই হয় নাই। তাহার পরেও ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসের নিম্নস্তরে ও তাহার বাহিরে সংস্কার ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ বহুদিন চলিয়াছিল; সেন-বর্মণ আমলে (একাদশ-দ্বাদশ শতকে) বর্ণসমাজের উচ্চস্তরে আযপূর্ব লোক সংস্কৃতির পরাভব প্রায় সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু তাহা সত্বেও বাঙালী সমাজের অন্তঃপুরে এবং একান্ত নিম্নস্তরে এই সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রভাব আজও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই—ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসের আদর্শ সেখানে শিথিল; দৈনন্দিন জীবনে, ধর্মে, লোকাচারে, ব্যবহারিক আদর্শে, ভাবনা-কল্পনায় আজও সেখানে আর্যপূর্ব সমাজের বিচিত্র স্মৃতি ও অভ্যাস সুস্পষ্ট। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে শিল্পে, ধর্মে, বর্তমান বাঙালীর ধ্যানে মননে আচারে ব্যবহারে এখনও সেই স্মৃতি বহমান, একথা কখনও ভুলিলে চলিবে না।

ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থের "বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা" এই পদে কেহ কেহ বঙ্গ, মগধ, চের এবং পাণ্ড্য কোমের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে করেন; এই সব কোমকে বলা হইয়াছে "বয়াংসি" বা 'পক্ষী-বিশেষাঃ,' এবং ইহারা যে আর্য-সংস্কৃতির বহির্ভূত তাহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে।[১৫] এই পদটির পাঠ ও ব্যাখ্যা এইভাবে হইতে পারে কিনা এ সম্বন্ধে মতভেদের অবসর বিদ্যমান। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদের লোকদিগের যে 'দস্যু' বলা হইয়াছে এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। এই দুইটি ছাড়া আর কোনও প্রাচীনতম গ্রন্থেই প্রাচীন বাংলার কোনও কোমের উল্লেখ নাই। বুঝা যাইতেছে, সেই সুপ্রাচীন কালে আর্যভাষীরা

১৫ ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১; Aita. Ara., ed. Keith, 101, 200.

তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সঙ্গে পরিচিতই হন নাই ; পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদি রচনার সময় তাঁহারা পুণ্ড্র, বঙ্গ, ইত্যাদি কোমের নাম শুনিতেছেন মাত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি গল্প এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। ঋষি বিশ্বামিত্র একটি ব্রাহ্মণ বালককে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন—দেবতার প্রীত্যর্থে যজ্ঞে বালকটিকে আহুতি দিবার আয়োজন হইয়াছিল, সেইখান হইতে বিশ্বমিত্র তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। যাহা হউক, পিতার এই পোষ্যপুত্র গ্রহণ বিশ্বামিত্রের পঞ্চাশটি পুত্রের সমর্থন লাভ করেন নাই। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র পুত্রদের অভিসম্পাত দেন যে তাঁহাদের সন্তানেরা যে উত্তরাধিকার লাভ করিবে তাহা একেবারে পৃথিবীর প্রান্ততম সীমায় (বিকল্পে: তাঁহাদের বংশধরেরা একেবারে সর্বনিম্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইবেন)। ইহারাই 'দস্যু' আখ্যাত অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, এবং মুতিব কোমের জন্মদাতা।[১৬] এই গল্পের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মহাভারতের এবং কতিপয় পুরাণের একটি গল্পেও শুনিতে পাওয়া যায়।[১৭] মহাভারতের অন্যত্র, ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বাংলার সমুদ্রতীরবাসী কোমগুলিকে বলা হইয়াছে 'ম্লেচ্ছ'; ভাগবত পুরাণে কিরাত হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, যবন, খস এবং সুহ্ম কোমের লোকদের বলা হইয়াছে 'পাপ'।[১৮] বৌধায়নের ধর্মসূত্রে আরট্ট (পঞ্জাব), পুণ্ড্র, (উত্তরবঙ্গ) সৌবীর (দক্ষিণ পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ), বঙ্গ (পূর্ব বাংলা), কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) প্রভৃতি কোমের লোকদের অবস্থিতি নির্দেশ করা হইয়াছে আর্যবহির্ভূত দেশের প্রত্যন্ততম সীমায়; ইহাদের বলা হইয়াছে "সংকীর্ণ

---

১৬ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।১৩-১৮

১৭ মহাভারত, সভাপর্ব, ৫২।১৭ ; বায়ুপুরাণ, ৯৯।১১।৮৫... ; মৎস্যপুরাণ, ৪৮।৭৭...

১৮ মহাভারত, ২।৩০ ; ভাগবতপুরাণ, ২৪।৪।১৮

যোনয়ঃ” এবং এই সব দেশ একেবারে আর্য-সংস্কৃতির বাহিরে, এই সব জনপদে কেহ স্বল্পকালের প্রবাসে গেলেও ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।[১৯] স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বৌধায়নের কালে বাংলাদেশের সঙ্গে পরিচয় যদি বা হইয়াছে, যাতায়াতও হয়ত কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তখনও আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দৃষ্টিতে এই সব অঞ্চলের লোকেরা ঘৃণিত এবং অবজ্ঞাত। এই ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রাচীন আর্য জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও কিছু কিছু দেখা যায়। আচারঙ্গ=আয়ারঙ্গ সূত্রের একটি গল্পে পথহীন রাঢ়দেশে মহাবীর এবং তাঁহার শিষ্যদের লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের যে-বর্ণনা আছে, বজ্রভূমিতে যে অখাদ্য কুখাদ্য ভক্ষণের ইঙ্গিত আছে তাহাতে এই ঘৃণা ও অবজ্ঞা সুস্পষ্ট।[২০] বৌদ্ধ আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, সমতট ও হরিকেলের লোকদের ভাষাকে বলা হইয়াছে ‘অসুর’ ভাষা।[২১] এই সব বিচিত্র উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহারা এমন একটি সুদীর্ঘকালের স্মৃতি-ঐতিহ্য বহন করে যে-কালে আর্যভাষাভাষী এবং আর্য-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক উত্তর ও মধ্যভারতের লোকেরা পূর্বতম ভারতের বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, সুহ্ম প্রভৃতি কোমদের সঙ্গে পরিচিত ছিল না, যে-কালে এইসব কোমদের ভাষা ছিল ভিন্নতর, আচার-ব্যবহার অন্যতর। এই অন্যতর জাতি, অন্যতর আচার-ব্যবহার, অন্যতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং অন্যতর ভাষাভাষী লোকদের

---

১৯ বোধায়ন, ১।১।২৫-৩১

২০ আচারাঙ্গ সূত্র, ১।৮।৩ ; S. B. E. XXII. 84, 264

২১ Ed. Ganapati Sastri, ২২ পটল, পৃ. ২৩২-৩৩

সেইজন্যই বিজেতা, উন্নত ও পরাক্রান্ততর জাতিসুলভ দর্পিত উন্নাসিকতায় বলা হইয়াছে, 'দস্যু', 'ম্লেচ্ছ', 'পাপ', 'অসুর' ইত্যাদি।

কিন্তু এই দর্পিত উন্নাসিকতা বহুকাল স্থায়ী হয় নাই। নানা বিরোধ সংঘর্ষের ভিতর দিয়া এইসব দস্যু, ম্লেচ্ছ, অসুর, পাপ কোমের লোকদের সঙ্গে আর্যভাষাভাষী লোকদের মেলামেশা হইতেছিল। এই সব বিরোধ সংঘর্ষের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা পৌরাণিক গল্পে—রামায়ণে রঘুর দিগ্বিজয়, মহাভারতে কর্ণ, কৃষ্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয়, আচারঙ্গসূত্রে মহাবীরের রাঢদেশে জৈনধর্ম প্রচার, ইত্যাদি প্রসঙ্গে। ইহাদের মধ্য দিয়াই আর্য ও আর্যপূর্ব সংস্কৃতির মিলন-পথ প্রশস্ত হইতেছিল এবং আর্যপূর্ব সংস্কৃতির 'ম্লেচ্ছ' ও 'দস্যু'রা আর্যসমাজে স্বীকৃতি লাভ করিতেছিল। এই স্বীকৃতিলাভ ও আর্য-সমাজে অন্তর্ভুক্তির দুইটি দৃষ্টান্ত আহরণ করা যাইতে পারে। রামায়ণে দেখা যাইতেছে,[২২] মৎস্য-কাশী-কোশল কোমের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-অঙ্গ-মগধ কোমের রাজবংশগুলি অযোধ্যা রাজবংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। ইহাপেক্ষাও আর একটি অর্থবহ গল্প আছে বায়ু ও মৎস্যপুরাণে, মহাভারতে। এই গল্পে অসুররাজ বলির স্ত্রীর গর্ভে বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসের পাঁচটি পুত্র উৎপাদনের কথা বর্ণিত আছে; এই পাঁচপুত্রের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম; ইহাদের নাম হইতেই পাঁচ পাঁচটি কোম জনপদের নামের উদ্ভব।[২৩]

প্রাথমিক পরাভব ও যোগাযোগের পর বাংলাদেশের এইসব দস্যু ও ম্লেচ্ছ কোমগুলি ধীরে ধীরে আর্যসমাজ ব্যবস্থায় কথঞ্চিৎ

---

২২ রামায়ণ, ২।১০।৩৬-৩৭

২৩ মহাভারত, সভাপর্ব ৫২।১৭; বায়ুপুরাণ ৯৯।১১।৮৫...; মৎস্যপুরাণ, ৪৮।৭৭...

স্বীকৃতি ও স্থান লাভ করিতে আরম্ভ করিল। এই স্বীকৃতি ও স্থানলাভ যে একদিনে ঘটে নাই, তাহা তো সহজেই অনুমেয়; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একদিকে বিরোধ ও সংঘর্ষ অন্যদিকে স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তি চলিয়াছিল—কখনও ধীর শান্ত, কখনও দ্রুত কঠোর প্রবাহে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পরাভব ঘটিয়াছিল আগে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরাভব ঘটিয়াছিল ক্রমে ক্রমে, অনেক পরে, এ সম্বন্ধেও সন্দেহের অবসর কম। মানব-ধর্মশাস্ত্রে আর্যাবর্তের সীমা দেওয়া হইতেছে পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্বসমুদ্রতীর পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রাচীন বাংলাদেশের অন্ততঃ কিয়দংশও আর্যাবর্তের অন্তর্গত, এই যেন ইঙ্গিত।[২৪] মনু পুণ্ড্র কোমের লোকদের বলিতেছেন 'ব্রাত্য' বা পতিত ক্ষত্রিয়, এবং তাহাদের পংক্তিভুক্ত করিতেছেন দ্রাবিড়, শক, চীন প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিদের সঙ্গে। মহাভারতের সভাপর্বে[২৫] কিন্তু বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের যথার্থ ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে; জৈন প্রজ্ঞাপনা গ্রন্থেও বঙ্গ এবং লাঢ় কোম দুটিকে আর্য কোম বলা হইয়াছে।[২৬] শুধু তাহাই নয়, মহাভারতেই দেখিতেছি, প্রাচীন বাংলার কোনও কোনও স্থান তীর্থ বলিয়া স্বীকৃত ও পরিগণিত হইতেছে, যেমন পুণ্ড্রভূমিতে করতোয়াতীর, সুহ্মদেশের ভাগীরথী সাগর-সঙ্গম।[২৭] অর্জুন অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের তীর্থস্থানসমূহ পরিভ্রমণকালে ব্রাহ্মণদিগকে নানাপ্রকারে উপহৃত করিয়াছিলেন; বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে (৩য়-৪র্থ শতক)

---

২৪ মানবধর্মশাস্ত্র,

২৫ ৫২।১৭

২৬ Ind. Ant. p. 375

২৭ বনপর্ব, ৮৫।২-৪; ১।২১৬, কামসূত্র, ৬।৩৮, ৪১

গৌড়-বঙ্গের ব্রাহ্মণদের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ বাংলা এবং বাঙালীর আর্যীকরণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, ইহাই এইসব পুরাণ-কথার ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিতের সমর্থন পাওয়া যায় মহাভারত ও পুরাণগুলিতে। বায়ু ও মৎস্যপুরাণে, মহাভারতে বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্রদের তো ক্ষত্রিয়ই বলা হইয়াছে, এমন কি শবর, পুলিন্দ এবং কিরাতদেরও।[২৮] কোনও কোনও বংশ যে ব্রাহ্মণ পর্যায়েও স্বীকৃত ও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, ঋষি দীর্ঘতমসের গল্পটি তাহার কতকটা প্রমাণ বহন করে। কিন্তু অধিকাংশ বিজিত লোকই স্বীকৃত ও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল শূদ্র-বর্ণ পর্যায়ে, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। মনু বলিতেছেন, পৌণ্ড্রক ও কিরাতেরা ক্ষত্রিয় ছিল, কিন্তু বহুদিন তাহারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংস্পর্শে না আসায় তাহারা ব্রাহ্মণ্য পূজাচার প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছিল, এবং সেই হেতু তাহাদের শূদ্র পর্যায়ে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।[২৯] অন্যান্য কোমদের ক্ষেত্রেও বোধ হয় এইরূপ হইয়া থাকিবে। মনু কৈবর্তদের বলিয়াছেন সংকর বর্ণ, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ তাহাদের বলিতেছে "অব্রহ্মণ্য," অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সমাজ বহির্ভূত। কিন্তু একদিকে স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্তি এবং আর একদিকে উন্নীত অবনীতকরণ যাহাই চলিতে থাকুক না কেন, এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে আর্য সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর্য বর্ণবিন্যাসও বাংলা দেশে ক্রমশঃ তাহার মূল প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরাই যে আর্য সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা বাংলাদেশে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহাই নয়, জৈন ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরাও

---

২৮ মহাভারত, ১।১০৪, ২।৫১, ১৪।২৯, বিষ্ণুপুরাণ, ৪।৮।১ ; মৎস্যপুরাণ, ৪৮।২৪, মনু-স্মৃতি, ১০।৪৪।

২৯ মনুস্মৃতি, ১০।৪৪

এ-সম্বন্ধে সমান কৃতিত্বের দাবি করিতে পারেন। তাঁহারা বেদবিরোধী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আর্য সমাজ-ব্যবস্থা বিরোধী ছিলেন না, এবং বর্ণ-ব্যবস্থাও একেবারে অস্বীকার করেন নাই।[৩০]

মৌর্য ও শুঙ্গাধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া আর্য সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা ক্রমশঃ বাংলাদেশে অধিকতর প্রসার লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রের আধিপত্যকালে। কিন্তু, মহাস্থান লিপির গলদন পুরাদস্তুর বাংলা নাম বলিয়াই মনে হইতেছে; প্রাকৃত গলদনকে সংস্কৃত গলদন করিলেও তাহার দেশজ রূপ অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়। লিপিটির ভাষা প্রাকৃত; মৌর্য আমলের সবলিপির ভাষাই ত তাহাই; কিন্তু রাষ্ট্রে যে আর্য সামাজিক আদর্শ গৃহীত ও স্বীকৃত হইতেছিল তাহা সুস্পষ্ট। বোধ হয় এই সময় হইতেই ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার, রাষ্ট্রকর্ম প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া অধিকতর সংখ্যায় উত্তর ভারতীয় আর্যভাষীরা বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিতে থাকে। কিন্তু আর্য, বৌদ্ধ, জৈন এবং সর্বোপরি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা গুপ্তকালের আগে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, এবং আর্য বর্ণব্যবস্থাও বাংলাদেশে বোধ হয় তাহার আগে দানা বাঁধিয়া গড়িয়া উঠে নাই।

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনপদ গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সমাজ উত্তরভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইতে আরম্ভ করে। এই যুগের লিপিমালাই[৩১] তাহার

৩০ Rhys Davids, Buddhist India.

৩১ এই পর্বে যে-সমস্ত লিপি হইতে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহার তালিকা ও সূচীর জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

নিঃসংশয় সাক্ষ্য বহন করিতেছে। লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে অনেকগুলি তথ্য জানা যায়।

প্রথমেই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে অগণিত ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠানের। ১ নং দামোদরপুর লিপিতে (খ্রীষ্টাব্দ ৪৪৩-৪৪) জনৈক কর্পটিক-নামীয় ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র যজ্ঞকার্য সম্পাদনের জন্য ভূমিক্রয় প্রার্থনা করিতেছেন; ২ নং পট্টোলি দ্বারা (৪৪৮-৪৯) পঞ্চ মহাযজ্ঞের জন্য আর এক ব্রাহ্মণকে ভূমি দেওয়া হইতেছে; ধনাইদহ পট্টোলির (৪৩২-৩৩) বলে কটকনিবাসী এক ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ কিছু ভূমি লাভ করিতেছেন; ৩ নং দামোদরপুর পট্টোলিতে (৪৮২-৮৩) পাইতেছি নাভক নামে এক ব্যক্তি কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বসাইবার জন্য কিছু ভূমি ক্রয় করিতেছেন; ৪ নং দামোদরপুর লিপিতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, নগরশ্রেষ্ঠী রিভুপাল হিমালয়ের পাদদেশে ডোঙ্গাগ্রামে কোকামুখস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী এবং নামলিঙ্গের পূজা ও সেবার জন্য ভূমিক্রয় করিতেছেন; বৈগ্রাম পট্টোলির (৪৪৭-৪৮) সংবাদ, ভোয়িল এবং ভাস্কর নামে দুই ভাই গোবিন্দস্বামীর নিত্য পূজার জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছেন; ৫ নং দামোদর পট্টোলিতে (৫৪৩-৪৪) দেখিতেছি শ্বেতবরাহস্বামীর মন্দির সংস্কারের জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছেন অযোধ্যাবাসী কুলপুত্রক অমৃতদেব। এ সমস্ত লিপিই পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ভূমি সম্বন্ধীয়। এই অনুমান নিঃসংশয় যে পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, এই ধর্মের দেবদেবীরা পূজিত হইতেছেন, ব্রাহ্মণদের বসবাস বিস্তৃত হইতেছে, অব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করিতেছেন, আনিয়া বসবাস করাইতেছেন, এবং অযোধ্যাবাসী ভিন্-প্রদেশী আসিয়াও এইদেশে মন্দির সংস্কার করাইবার জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছেন।

যে সব ব্রাহ্মণেরা আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে বেদবিদ্ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণও আছেন। উত্তরবঙ্গের সংবাদ বোধ হয় আরও পাওয়া যায় কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের নিধনপুর লিপিতে। লিপিটি সপ্তম শতকের, পট্টোলি কর্ণসুবর্ণ জয়স্কান্ধাবার হইতে নির্গত ; দত্তভূমি চন্দ্র-পুরি বিষয়ের ময়ূরশাল্মলাগ্রহার ক্ষেত্র, এবং এই ভূমিদানকার্য ভাস্করের চারি পুরুষ পূর্বে বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্মণদ্বারা (আনুমানিক ষষ্ঠ শতকের প্রথম পাদ) প্রথম সম্পাদিত হইয়াছিল। চন্দ্রপুরি বিষয় বা ময়ূরশাল্মল অগ্রহার কোথায় তাহা আজও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই ; তবে উত্তরবঙ্গের পূর্বতন সীমায় (রংপুর জেলায়) কিংবা একেবারে শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড (লিপির আবিষ্কার স্থান) অঞ্চল, এ দুয়ের এক জায়গায় হওয়াই সম্ভব, যদিও রংপুর অঞ্চল হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। যাহাই হউক, এই লিপিতে দেখা যাইতেছে ময়ূরশাল্মল অগ্রহারে ভূতিবর্মণ ভিন্ন ভিন্ন বেদের ৫৬টি বিভিন্ন গোত্রীয় অন্তত ২০৫ জন 'বৈদিক' বা 'সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণের বসতি করাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সকলেই বাজসনেয়ী, ছান্দোগ্য, বাহ্বৃচ্য, চারক্য এবং তৈত্তিরীয়, এই পাঁচটি বেদ-পরিচয়ের অন্তর্গত, তবে যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী-পরিচয়ের সংখ্যাই অধিক। চারক্য এবং তৈত্তিরীয়েরাও যজুর্বেদীয় ; বাহ্বৃচ্য ঋগ্বেদীয় ; ছান্দোগ্য সামবেদীয়। ইঁহাদের অধিকাংশের পদবী স্বামী। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই উত্তরপূর্ব-বাংলায় (ভিন্ন মতে, শ্রীহট্ট অঞ্চলে) পুরাদস্তুর ব্রাহ্মণ-সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বোক্ত অন্যান্য লিপির সাক্ষ্যও তাহাই। ভূমি দান-বিক্রয় যে সব গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে নিষ্পন্ন হইতেছে তাহাদের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণের দর্শন মিলিতেছে ; ইঁহাদের নামপদবী শর্মণ এবং স্বামী দুইই পাওয়া যাইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের খবর পাওয়া যাইতেছে বিজয়সেনের মল্লসারুল লিপি (ষষ্ঠ শতক) এবং জয়নাগের বপ্যঘোষবাট লিপিতে (সপ্তম শতক)। শেষোক্ত লিপিটিদ্বারা মহাপ্রতীহার সূর্যসেন বপ্যঘোষবাট-নামক একটি গ্রাম ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী নামে এক ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন, এই লিপিতেই খবর পাওয়া যাইতেছে কুক্কুট গ্রামের ব্রাহ্মণদের ভট্ট উন্মীলন স্বামী এবং ভবশি স্বামী নামে আরও দুইটি ব্রাহ্মণের দেখা এখানেই মিলিতেছে এক্ষেত্রেও নাম-পদবী স্বামী। মল্লাসারুল লিপিতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, দৈনিক পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিষ্পন্নের জন্য মহারাজ বিজয়সেন বৎসস্বামীনামক জনৈক ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণকে কিছু ভূমি দান করিতেছেন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে রাঢ়া রাষ্ট্রেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বর্ণব্যবস্থা ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই স্বীকৃত ও প্রসারিত হইয়াছে। এই তথ্যের প্রমাণ আরও পাওয়া যায় সদ্য আবিষ্কৃত শশাঙ্কের মেদিনীপুর লিপি দুইটীতে। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে দণ্ডভুক্তিদেশেও যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বর্ণব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছিল তাহা সিদ্ধান্ত করা যায় ইহাদের সাক্ষ্যে।

মধ্য ও পূর্ববঙ্গেও এই যুগে অনুরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গোপচন্দ্রের একটি পট্টোলিদত্ত ভূমির দানগ্রহীতা হইতেছেন লৌহিত্য তীরবাসী জনৈক কান্বগোত্রীয় ব্রাহ্মণ, ভট্টগোমীদত্ত স্বামী। যে-মণ্ডলে (বারকমণ্ডলে ; ফরিদপুর জেলায়) দত্ত ভূমির অবস্থিতি তাহার শাসনকর্তাও ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম বৎসপাল স্বামী। এই বংশের আর এক রাজা ধর্মাদিত্যের একটি পট্টোলিদত্ত ভূমির দান-গ্রহীতা হইতেছেন ব্রাহ্মণ চন্দ্রস্বামী, আর একটির জনৈক বসুদেব স্বামী। শেষোক্ত পট্টোলিতে গর্গস্বামী নামে আর এক ব্রাহ্মণের ভূমিরও

খবর পাওয়া যাইতেছে। তখনও বারকমণ্ডলের শাসনকর্তা একজন ব্রাহ্মণ, নাম গোপালস্বামী। ধর্মাদিত্যের প্রথম পট্টোলিটিতে গ্রামবাসিদের মধ্যেও দুইজন ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় একজনের নাম বৃহচ্চট্ট, আর একজনের কুলস্বামী। মহারাজ সমাচার দেবের ঘুগ্রাহাটি লিপির দত্তভূমির দানগ্রহীতাও একজন ব্রাহ্মণ, নাম সুপ্রতীক স্বামী এবং দান-গ্রহণের উদ্দেশ্য বলিচরুসত্র প্রবর্তন। ষষ্ঠ শতকের ফরিদপুর ছাড়িয়া সপ্তম শতকের ত্রিপুরার লোকনাথ লিপির সাক্ষ্যও একই প্রকার; এখানেও দেখিতেছি জনৈক ব্রাহ্মণ মহাসামন্ত প্রদোষশর্মা অনন্তনারায়ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ২১১ জন চাতুর্বিদ্য ব্রাহ্মণের বসতি করাইবার জন্য পশুসংকুল বনপ্রদেশে ভূমিদান গ্রহণ করিতেছেন। গ্রামকুটম্বি অর্থাৎ গৃহস্থদের মধ্যে শর্মা ও স্বামী পদবীযুক্ত অনেক নাম পাইতেছি, যথা মঘশর্মা, হরিশর্মা, রুষ্টশর্মা, অহিশর্মা গুপ্তশর্মা, ক্রমশর্মা, শুক্রশর্মা, কৈবর্তশর্মা, হিমশর্মা, লক্ষ্মণশর্মা, নাথ-শর্মা, অলাতস্বামী, ব্রহ্মস্বামী, মহাসেনভট্টস্বামী, বামনস্বামী, ধনস্বামী, জীবস্বামী, ইত্যাদি।

শুধু যে ব্রাহ্মণেরাই ভূমিদান লাভ করিতেছেন তাহাই নয়; জৈন ও বৌদ্ধ আচার্যরা এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানগুলিও অনুরূপ ভূমিদান লাভ করিয়াছেন। পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গে পাহাড়পুর অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি লিপিতে দেখিতেছি (৪৭৮-৭৯ খ্রী) জনৈক ব্রাহ্মণ নাথশর্মা এবং তাঁহার স্ত্রী রামী এক জৈন আচার্য গুহনন্দির বিহারে দানের জন্য কিছু ভূমি ক্রয় করিতেছেন। ষষ্ঠ শতকে (গুনাইঘর লিপি, ৫০৭-৮ খ্রী) ত্রিপুরা জেলায় জনৈক মহাযানাচার্য শান্তিদেব প্রতিষ্ঠিত আর্য অবলোকিতেশ্বরের আশ্রম বিহারের মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘের জন্য মহারাজ রুদ্রদত্ত কিছু ভূমি দান করিতেছেন। এই লিপিটিতেও একজন ব্রাহ্মণ কুমারা-

মাত্য বেরজ্জ স্বামীর সংবাদ পাইতেছি। সপ্তম-অষ্টম শতকে ঢাকা জেলার আস্রফপুর অঞ্চলে দেখিতেছি জনৈক বৌদ্ধ আচার্য বন্দ্য সংঘমিত্র তাঁহার বিহার ইত্যাদির জন্য স্বয়ং রাজার নিকট হইতে প্রচুর ভূমিদান লাভ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণদের পদবী ও গাঞি (?) পরিচয়

উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ হইতে দেখা যাইতেছে শর্মণ ও স্বামী পদবী ছাড়া ব্রাহ্মণদের বোধ হয় অন্য পদবী-পরিচয়ও ছিল। যেমন, বৃহচ্চট্ট নামে চট্ট, ভট্ট গোমিদত্ত স্বামী, ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী, ভট্ট উন্মীলন স্বামী, ভট্ট বামন স্বামী, মহাসেন ভট্ট স্বামী, এবং শ্রীনেত্র ভট (ভট) প্রভৃতি নামে ভট্ট, এবং বন্দ্য জ্ঞানমতি ও বন্দ্য সংঘমিত্র নামে বন্দ্য। বৃহচ্চট্টের চট্ট নামের অংশমাত্র বলিয়া মনে হইতেছে না। ব্রহ্মবীর, উন্মীলন, বামন এবং মহাসেন যে ব্রাহ্মণ তাহা তাহাদের স্বামী পদবীতেই পরিষ্কার; কিন্তু তাহার পরেও যখন তাহাদের নামের পূর্বে অথবা মধ্যে ভট্ট ব্যবহৃত হইতেছে তখন ভট্ট যেন তাঁহাদের "গাঞি" পরিচয় বলিয়াই মনে হইতেছে। পরবর্তী কালের ভাট অর্থ এই ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। শ্রীনেত্র ভট স্পষ্টই শ্রীনেত্র ভট্ট এবং এক্ষেত্রে ভট্ট ব্যবহৃত হইয়াছে নামের পরে। বন্দ্য পজনীয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে, অন্ততঃ আচার্য বন্দ্য সংঘমিত্রের ক্ষেত্রে; কিন্তু বন্দ্য জ্ঞানমতির ক্ষেত্রেও কি তাহাই? এক্ষেত্রেও বন্দ্য "গাঞি" পরিচয় হওয়া অসম্ভব নয়। চট্ট, ভট্ট এবং বন্দ্য, এই কটিই যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের অসংখ্য "গাঞি" পরিচয়ের মধ্যে তিনটি, এ-তথ্য পরবর্তী স্মৃতি ও কুলজীগ্রন্থে জানা যায়। ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই এই "গাঞি" পরিচয়ের রীতি প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা অসম্ভব এবং অনৈতিহাসিক নাও হইতে পারে।

ব্রাহ্মণদের শর্মণ-শর্মা পদবী-পরিচয় বাংলাদেশে আজও সুপ্রচলিত। কিন্তু স্বামী পদবী-পরিচয় মধ্যযুগের সূচনা হইতেই অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। নিধনপুর লিপির সাক্ষ্য ও শ্রীহট্ট অঞ্চলের লোকস্মৃতি হইতে মনে হয়, ঐ লিপির দুই শতাধিক স্বামী পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণেরা বৈদিক (পরবর্তী কালে, সাম্প্রদায়িক) ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অনুমান হয়, ইহারা সকলেই বাংলাদেশের বাহির হইতে—পশ্চিম বা দক্ষিণ হইতে—আসিয়াছিলেন। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে তো এখনও ব্রাহ্মণদের স্বামী পদবী সুপ্রচলিত, প্রাচীন কালেও তাহাই ছিল। উত্তর-ভারতেও যে তাহা ছিল তাহার প্রমাণ গুপ্তযুগের লিপিমালায়ই পাওয়া যায়। পরবর্তী কালের কুলজী-গ্রন্থে বৈদিক ব্রাহ্মণদের দুই শাখার পরিচয় পাওয়া যায়ঃ পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য। এই সব স্বামী পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণেরা পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ হওয়া অসম্ভব নয়। বনাইদহ পট্টোলির দানগ্রহীতা বরাহস্বামী ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ, এবং তিনি আসিয়াছিলেন উড়িষ্যাপ্রান্ত কটক অঞ্চল হইতে। গোপচন্দ্রের একটি পট্টোলির দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণ-টির নাম গোমিদত্ত স্বামী, তিনি কাণ্বগোত্রীয় এবং লৌহিত্য-তীরবাসী। লৌহিত্য-তীরবর্তী কামরূপের ব্রাহ্মণেরা তো আজও নিজেদের পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। অবশ্য, স্বামী পদবীর উপর নির্ভর করিয়া এসম্বন্ধে নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত কিছু করা চলে না। বাহির হইতে ব্রাহ্মণেরা যে বাংলাদেশে আসিতেছেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অযোধ্যাবাসী কুলপুত্রক অমৃতদেব স্বয়ং।

এই সব ব্রাহ্মণদের ছাড়া পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপি-গুলিতে রাজকর্মচারী, গ্রামবাসী গৃহস্থ, প্রধান প্রধান লোক, নগরবাসী শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ এবং অন্যান্য লোকের নাম-পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে।

কয়েকটি নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে : যথা, চিরাতদত্ত, বেত্রবর্মণ, ধৃতিপাল, বন্ধুমিত্র, ধৃতিমিত্র, শাম্বপাল, রিশিদত্ত (লক্ষণীয় এই যে, নামটির বানান ঋষিদত্ত হওয়া উচিত ছিল ; সংস্কৃত রীতিপদ্ধতি তখনও অভ্যস্ত হয় নাই বলিয়া মনে করা চলে), জয়নন্দি, বিভুদত্ত, গুহনন্দি, দিবাকরনন্দি, ধৃতিবিষ্ণু, বিরোচন, রামদাস, হরিদাস, শশিনন্দী, দেবকীর্তি, ক্ষেমদত্ত, গোষ্ঠক, বর্গপাল, পিঙ্গল, সুংকুক, বিষ্ণুভদ্র, খাসক, রামক, গোপাল, শ্রীভদ্র, সোমপাল, রাম, পত্রদাস, স্থায়ণপাল, কপিল, জয়দত্ত, শণ্ডক, রিভু-পাল, কুলবৃদ্ধি, ভোয়িল, ভাস্কর, নবনন্দী, জয়নন্দী, ভটনন্দী, শিবনন্দী, দুর্গাদত্ত, হিমদত্ত, অর্কদাস, রুদ্রদত্ত, ভীম, ভামহ, বৎসভোজিক, নরদত্ত বরদত্ত, বপ্যিক, আদিত্যবন্ধু, জোলারি, নগিজোদক, বুদ্ধক, কলক, সূর্য, মহীপাল, খন্দবিদুর্গ্গবিক, মণিভদ্র, যজ্ঞরাত, নাদভদক, গণেশ্বর, জিতসেন, রিভুপাল, স্থাণুদত্ত, মতিদত্ত, বিপ্রপাল, স্কন্দপাল, জীবদত্ত, পবিক্রক, দামুক, বৎসকুণ্ড, শুচিপালিত, বিহিতঘোষ, শূরদত্ত, প্রিয়দত্ত, জনার্দন, কুণ্ড, কবিনিক, নন্দনাগ, কেশব, ইটিত, কুলচন্দ্র, গরুড়, আলুক, অনাচার, ভাইশত্য, শুভদেব, ঘোষচন্দ্র, অনমিত্র, গুণচন্দ্র, কলসথ, দুর্লভ, সত্যচন্দ্র, প্রভুচন্দ্র, রুদ্রদাস, অর্জুন-বপ্প (সোজাসুজি অর্জুনের বাপের সংস্কৃত রূপ, এই ধরণের ডাক-নাম আজও বাংলার পাড়াগাঁয়ে প্রচলিত), কুণ্ডলিপ্ত, নাগদেব, নয়সেন, সোমঘোষ, জন্মভূতি, সূর্যসেন, লক্ষ্মীনাথ, শ্রীমিত্রাবলি, বর্ণটিয়োক, শর্বান্তর, শিখর, পুরদাস, শক্রক, উপাসক, স্বস্তিয়োক, স্থলক্ক, রাজদাস, দুর্গ্গট ইত্যাদি। এই নামগুলি বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি তথ্য লক্ষ্যগোচর হয়। প্রথমত, অধিকাংশ নামের রূপ সংস্কৃত : কতকগুলি নামের দেশজ রূপ হইতে সংস্কৃতীকরণ হইয়াছে, যেমন বপ্যিক, খন্দবিদুর্গ্গরিক, অর্জুনবপ্প, বর্ণটিয়োক, দুর্গ্গট ইত্যাদি ; আর কতকগুলির নামরূপ দেশজই থাকিয়া গিয়াছে, যেমন, জোলারি,

নগিজোদক, কলক, নাদভদক, দামুক, আলুক, কলসথ, ইটিত, সুংকুক, খাসক ইত্যাদি। 'অক্' বা 'ওক্' প্রত্যয় জুড়িয়া দিয়া দেশজ বা ভাষা শব্দের নামকে সংস্কৃত ক-কারান্ত পদরূপে দেখাইবার যে রীতি আমরা পরবর্তী কালে বাংলা দেশে প্রচলিত দেখিতে পাই (যেমন "সদুক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থে গৌড় বঙ্গের কবিদের নাম-পরিচয়ে, এবং অন্যত্র) তাহাও এই যুগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, যথা, খাসক, রামক, বপ্পিযক, বর্ণটিযোক, নগিজোদক, নাদভদক, স্বপ্নিয়োক ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত নামে জনসাধারণ সাধারণত কোনও পদবী ব্যবহার করিত না, শুধু পূর্বনামেই (forename) পরিচিত হইত (এমন নামের সংখ্যাই অধিক), যেমন, পিঙ্গল, গোপাল, শ্রীভদ্র, রাম, কপিল, বিরোচন, দেবকীর্তি, গোষ্ঠক, শণ্ডক, ভোয়িল, ভাস্কর, ভামহ, বুদ্ধক, স্থগ, পবিক্রক, করণিক, কেশব, গরুড, অনাচার, ভাইশর্মা, ঠল্লভ, শবরস্বর, শিখর, শক্রক, উপাসক, স্থূলব্ধ, গরুড ইত্যাদি। তৃতীয়ত, এই নামগুলির মধ্যে কতকগুলি অন্ত্যনামের (surname) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে যেগুলি এখনও বাংলাদেশে নাম-পদবী হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন, দত্ত, পাল, মিত্র, নন্দি-নন্দী, বর্মণ, দাস, ভদ্র, সেন, দেব, ঘোষ, কুণ্ড, পালিত, নাগ, চন্দ্র, এমন কি দাম (দা), ভূতি, বিষ্ণু, যশ, শিব, রুদ্র ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে এগুলি অন্ত্যনাম এসম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নামেরই অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই অনুমানও হয়তো করা চলে। চতুর্থত, এই সব অন্ত্যনাম আজকাল যেমন বর্ণজ্ঞাপক, পঞ্চম-অষ্টম শতকে তেমন ছিল না, তবে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের লোকেরাই এই অন্ত্যনামগুলি ব্যবহার করিতেন; ব্রাহ্মণেরা শুধু শর্মণ বা স্বামী পদবী এবং ভট, চট্ট, বন্দ্য প্রভৃতি "গাঞি" পরিচয় গ্রহণ করিতেন, এইরূপ অনুমান বোধ

হয় করা যায়। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য তথাকথিত 'ভদ্র' জাতের মধ্যে (বৃহদ্ধর্ম পুরাণোক্ত উত্তম সংকর ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণোক্ত সৎশূদ্র জাতের মধ্যে) চন্দ্র, গুপ্ত, নাগ, দাস, আদিত্য, নন্দী, মিত্র, শীল, ধর, কর, দত্ত, রক্ষিত, ভদ্র, দেব, পালিত প্রভৃতি নামাংশ বা পদবীর ব্যবহার এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়া হিন্দু আমলের শেষেও যে চলিতেছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় "সদুক্তিকর্ণামৃত"-গ্রন্থের গৌড়বঙ্গীয় কবিদের নামের মধ্যে।[১] একথা সত্য বাংলার বাহিরে, বিশেষভাবে গুজরাত-কাথিয়াবাড় অঞ্চলে প্রাচীন কালে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যেও দত্ত, নাগ, মিত্র ঘোষ, এবং বর্মণ ইত্যাদি অন্ত্যনামের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু বাংলার এই লিপিগুলিতে এই সব অন্ত্যনাম যে-সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হইতেছে, তাহাদের একজনকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হইতেছে না, ব্রাহ্মণেরা যেন সর্বত্রই শর্মণ বা স্বামী এই অন্ত্যনামে পরিচিত হইতেছেন, অথবা ভট্ট, চট্ট, বন্দ্য প্রভৃতি উপ বা অন্ত্য নামে।

লিপিগুলিতে অনেক ব্যক্তিনামের উল্লেখ যেমন আছে, তেমনই আছে অনেক স্থান নামের উল্লেখ। এই নামগুলি বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, কতকগুলি নামের রূপ পুরাপুরি সংস্কৃত, যেমন, পুণ্ড্রবর্ধন, কোটীবর্ষ, পঞ্চনগরী, নব্যাবকাশিকা, সুবর্ণবীথি, ঔদুম্বরিক (বিষয়), চণ্ডগ্রাম, কর্মান্তবাসক, শিলাকুণ্ড, পলাশবৃন্দক, স্বচ্ছন্দ পাটক ইত্যাদি। কতকগুলি নামের দেশজরূপ হইতে সংস্কৃতীকরণ হইয়াছে, যেমন, বারিগ্রাম, পৃষ্ঠিম-পোট্টক, গোষাটপুঞ্জক, খাড়া(টা)পার, ত্রিবৃতা, ত্রিঘট্টিক, বোল্লবায়িকা ইত্যাদি। আবার, কতকগুলির নাম এখনও

১ সদুক্তিকর্ণামৃত, সংকলয়িতা শ্রীধরদাস (১২০৬), Ed by Ramavatara Sarma and Haradatta Sarma, Lahore. 1936. শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, "সদুক্তিকর্ণামৃত" বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক-পৌষ, ১৩৫০।

দেশজ রূপেই থাকিয়া গিয়াছে, যেমন, কুট্‌কুট্‌, নাগিরট, ডোঙ্গা (গ্রাম), কণমোটিকা ইত্যাদি। মনে হয়, ব্যক্তি-নামের ক্ষেত্রে যেমন স্থান-নামের ক্ষেত্রেও তেমনই, আর্যীকরণ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

কায়স্থ-করণ

উপরোক্ত অন্ত্যনামগুলি যাহাদের ব্যক্তিনামের সঙ্গে ব্যবহৃত হইতেছে তাহারা কোন্‌ বর্ণ বা উপবর্ণের স্থির করিবার কোনও উপায় নাই, একথা আগেই বলিয়াছি। এই যুগের লিপিগুলিতে কায়স্থ নামে পরিচিত এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর সংবাদ পাওয়া যায়, যেমন, প্রথম কায়স্থ শাম্বপাল, স্কন্দপাল, বিপ্রপাল, করণ-কায়স্থ নরদত্ত, কায়স্থ প্রভুচন্দ্র, রুদ্রদাস, দেবদত্ত, কৃষ্ণদাস, জ্যেষ্ঠকায়স্থ নয়সেন, ইত্যাদি। ইহারা যে রাজকর্মচারী এসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। কায়স্থ বলিতে মূলত কোনও বর্ণ বা উপবর্ণ বুঝাইত না, কোষকার বৈজয়ন্তী (একাদশ শতক) কায়স্থ অর্থে বলিতেছেন লেখক, এবং কায়স্থ ও করণ সমার্থক ইহাও বলিতেছেন।[১] ক্ষীরস্বামী কৃত অমরকোষের টীকায়ও[২] করণ বলিতে কায়স্থদের মতই একশ্রেণীর রাজকর্মচারীকে বুঝান হইয়াছে। গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের দুইটি পট্টোলির লেখক জল্‌হণ একটিতে নিজের পরিচয় দিতেছেন কায়স্থ বলিয়া, আর একটিতে তিনি "করণিকোদ্গতো"।[৩] চান্দেল্লরাজ ভোজবর্মণের অজয়গড় লিপিতেও করণ ও কায়স্থ সমার্থক বলিয়া ধরা হইয়াছে।[৪]

---

১ "কায়স্থঃস্যাল্লিপিকরঃ করণোক্ষর জীবনঃ লেখকোক্ষর চুঞ্চুশ্চ"।

২ অমরকোষ।

৩ Ep. Ind IV, p. 140, VIII, p. 153

৪ Ep. Ind. I, p. 330

কায়স্থরা যে রাজকর্মচারী তাহা প্রাচীন বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিদ্বারাও সমর্থিত।[১] বিষ্ণুস্মৃতিমতে তাঁহারা রাজকীয় দলিল-পত্রাদির লেখক ছিলেন; যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকাকার বলেন কায়স্থরা ছিলেন লেখক ও হিসাবরক্ষক। এখনও তো বিহার অঞ্চলে হিসাব রাখার লিখনপদ্ধতির যে বিশিষ্ট ধরণ তাহাকে বলা হয় "কাইথী" লিপি। করণ শব্দও লেখক ও হিসাবরক্ষক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; সমস্ত পরবর্তী সাক্ষ্যের ইঙ্গিতই এইরূপ, দু'এক ক্ষেত্রে মাত্র করণ ও কায়স্থ দুইটি শব্দ পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন ৮৭০ খ্রীস্টাব্দের গুরমহা তাম্র পট্টোলিতে।[২] বৃহদ্ধর্মপুরাণে কিন্তু করণ ও কায়স্থ সমার্থক বলা হইয়াছে।[৩] উত্তর বিহারে করণ সম্প্রদায় এখনও কায়স্থদেরই একটি শাখা বলিয়া পরিগণিত, উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থরা আজও নিজেদের করণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মেদিনীপুর, উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশের করণরা চিত্রগুপ্তকেই তাঁহাদের আদিপুরুষ বলিয়া মনে করেন, বাঙালী কায়স্থরাও তো তাহাই করেন। প্রাচীন কালে যাহাই হউক, পরবর্তী কালে অর্থাৎ খ্রীস্টীয় নবম-দশম শতক নাগাদ বাংলাদেশে করণ ও কায়স্থ সমার্থক বলিয়াই বিবেচিত হইত; ভারতের অন্যত্রও হইত। বাংলাদেশে করণেরা ক্রমে কায়স্থ নামের মধ্যেই বিলীন হইয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক, আমরা যে-যুগের আলোচনা করিতেছি সেই যুগে বাংলার লিপিগুলিতে কায়স্থ শব্দের ব্যবহার যেমন পাইতেছি, তেমনই পাইতেছি করণ শব্দেরও। প্রাচীন গ্রীক ও পারসিক দলিলপত্রে কাইথিঅয়, ক্ষযতিয় নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর সংবাদ পাওয়া

১ Kane, History of Dharmasastra.

২ Bhandarkar, List of Inscriptions....no. 34.

৩ পরে দ্রষ্টব্য।

যায়; তাঁহারাও লেখক ও হিসাবরক্ষক। এই কাইথিঅয়-ক্ষত্রিয়-র সঙ্গে আমাদের কায়স্থ শব্দের একটা যোগাযোগ থাকা কিছু অসম্ভব নয়। এ তথ্য নিঃসংশয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে এই যুগের লিপিগুলিতে কায়স্থ কোনও বর্ণ বা উপবর্ণজ্ঞাপক শব্দ নয়—জীবনবৃত্তি-বাচক শব্দ, অর্থাৎ কায়স্থরা এই যুগে এখনও বর্ণ বা উপবর্ণ বলিয়া গড়িয়া উঠে নাই। এই যুগের অন্তত দুইটি লিপিতে করণদের উল্লেখ পাইতেছি। গুণাইঘর পট্টোলির লেখক সন্ধিবিগ্রহাধিক নরদত্ত ছিলেন করণ-কায়স্থ, এবং ত্রিপুরার লোকনাথ পট্টোলির মহারাজ লোকনাথও নিজের পরিচয় দিতেছেন করণ বলিয়া। করণ-কায়স্থ বলিয়া নরদত্তের আত্মপরিচয় লক্ষ্যণীয়, করণ এবং কায়স্থ একেবারে সমার্থক একথা স্পষ্ট না হইলেও উভয়ের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ বিদ্যমান তাহা এই ধরণের উল্লেখের মধ্যে যেন সুস্পষ্ট। লোকনাথের করণ-পরিচয়ও অন্য দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মাতামহ কেশবকে বলা হইয়াছে, 'পারশব'; পিতামহ 'দ্বিজবর', প্রপিতামহ 'দ্বিজসত্তমা,' এবং বৃদ্ধপ্রপিতামহ মুনি ভরদ্বাজের বংশধর। 'পরাশব কেশব' কথার অর্থ তো এই যে কেশবের ব্রাহ্মণ পিতা একজন শূদ্রাণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অথচ, কেশব ছিলেন রাজার সৈন্যাধ্যক্ষ, এবং সমসাময়িক রাষ্ট্রে ও সমাজে তিনি যথেষ্ট মান্যও ছিলেন। ব্রাহ্মণ বর ও শূদ্র কন্যার বিবাহ বোধ হয় তখনও সমাজে নিন্দনীয় ছিল না, পরবর্তী কালেও নিন্দনীয় না হউক অপ্রচলিত যে ছিল না তাহা তো স্মৃতিকার ভবদেব ভট্ট এবং জীমূতবাহনের রচনা হইতেই জানা যায়। লোকনাথের নিজের করণ-পরিচয়ের কারণ বলা বড় কঠিন। বুঝা যাইতেছে, লোকনাথের পিতা একজন পারশব-দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; এই জন্যই কি লোকনাথ বর্ণসমাজে নীচে নামিয়া গিয়াছিলেন, অথবা, তাঁহার পিতাও ছিলেন করণ? এক্ষেত্রে করণ বর্ণ

না বৃত্তিবাচক শব্দ তাহাও কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতেছে না। যাহা হউক, এইটুকু বুঝা গেল, করণ বা কায়স্থ এখনও নিঃসন্দেহে বর্ণ বা উপবর্ণ হিসাবে বিবেচিত হইতেছে না, এই দুই শব্দেরই ব্যবহার মোটামুটি বৃত্তিবাচক, তবে বৃত্তি ক্রমশ বর্ণে বিধিবদ্ধ হইবার দিকে ঝুঁকিতেছে।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য

উপরে আলোচিত ও বিশ্লেষিত নামগুলির মধ্যে আর কোন্ কোন্ বর্ণ বা উপবর্ণ আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা বলিবার উপায় নাই; অন্তত বিশেষ ভাবে কোনও বর্ণ বা উপবর্ণ উল্লিখিত হইতেছে না। বর্মণ অন্ত্যনাম কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাওয়া যাইতেছে, যেমন বেত্রবর্মণ সিংহবর্মণ, চন্দ্রবর্মণ ইত্যাদি। এই যুগে বর্মণান্ত্য নাম উত্তর-ভারতের অন্যত্র ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞাপক; কিন্তু বেত্রবর্মণ, চন্দ্রবর্মণ ক্ষত্রিয় কিনা বলা কঠিন, অন্তত তেমন দাবি কেহ করিতেছেন না। রাজা-রাজন্যরা ত সাধারণত ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করিয়া থাকেন, কিন্তু সমসাময়িক বাংলার রাজা-রাজন্যদের পক্ষ হইতেও তেমন দাবি কেহই জানায় নাই। পরবর্তী পাল রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিও নিঃসংশয় নয়, কেবল বিদেশাগত কোনও কোনও রাজবংশ এই দাবি করিয়াছেন। বস্তুত বাংলার স্মৃতি-পুরাণে-ঐতিহ্যে ক্ষত্রিয় বর্ণের সবিশেষ দাবি কাহারও যেন নাই! নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, ব্যাপারী-ব্যবসায়ীর উল্লেখ এযুগে প্রচুর; কিন্তু তাহাদের পক্ষ হইতেও বৈশ্যত্বের দাবি কেহ করিতেছে না—সমসাময়িক কালে তো নয়ই, পরবর্তী কালেও নয়। বাংলার স্মৃতি-পুরাণ-ঐতিহ্যে বিশিষ্ট পৃথক বর্ণ হিসাবে বৈশ্যবর্ণের স্বীকৃতি নাই। বল্লালচরিতে বণিক-সুবর্ণবণিকদের বৈশ্যত্বের দাবি করা হইয়াছে; কিন্তু এ সাক্ষ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন।

অন্যত্র কোথাও কাহারও সে দাবি নাই, স্মৃতিগন্থাদিতে নাই, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পর্যন্ত নাই। বস্তুত বাংলাদেশে কোনও কালেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুনির্দিষ্ট বর্ণহিসাবে গঠিত ও স্বীকৃত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয় না; অন্তত তাহার সপক্ষে বিশ্বাস-যোগ্য ঐতিহাসিক কোনও প্রমাণ নাই। ইহার কারণ কি বলা কঠিন। বহুদিন আগে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিয়াছিলেন,[১] বাংলার আর্যীকরণ ঋগ্বেদীয় আর্য সমাজব্যবস্থানুযায়ী হয় নাই, সেই জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্র লইয়া যে চাতুর্বর্ণ-সমাজ, বাংলাদেশে তাহার প্রচলন নাই। বাংলার বর্ণসমাজ অ্যাল্পীয় আর্য সমাজ-ব্যবস্থানুযায়ী গঠিত, এবং অ্যাল্পীয় আর্যভাষীরা ঋগ্বেদীয় আর্যভাষী হইতে পৃথক। চন্দ মহাশয়ের এই মত যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহার মধ্যে বাংলার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের প্রায়ানুপস্থিতির কারণ নিহিত থাকা অসম্ভব নয়। বাংলার বর্ণবিন্যাস ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রবর্ণ ও অন্ত্যজ-ম্লেচ্ছদের লইয়া গঠিত; করণ-কায়স্থ, অম্বষ্ঠ-বৈদ্য এবং অন্যান্য সংকর বর্ণ সমস্তই শূদ্র-পর্যায়ে; সর্বনিম্নে অন্ত্যজ বর্ণের লোকেরা। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের এই বর্ণবিন্যাস পঞ্চম-অষ্টম শতকে খুব সুস্পষ্টভাবে দেখা না দিলেও তাহার মোটামুটি কাঠামো এই যুগেই গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই অনুমান করা চলে। কারণ, এই যুগের লিপিগুলিতে তিনটি দ্বিজ-বর্ণের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণদেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ধরা পড়িতেছে; আর যাহারা, তাঁহারা এবং অন্যান্যে বিচিত্র জীবন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া শূদ্রান্তর্গত বিভিন্ন উপবর্ণ গড়িয়া উঠিতেছে মাত্র; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের কোন ইঙ্গিত-আভাস কিছুই নাই।

---

১ Chanda, Indo-Aryan Races

পাল যুগ

বর্ণ হিসাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের ইঙ্গিত আভাস পরবর্তী পাল আমলেও[১] দেখা যাইতেছে না। একমাত্র "রামচরিত" গ্রন্থের টীকাকার পাল-বংশকে ক্ষত্রিয়-বংশ বলিয়া দাবি করিয়াছেন।[২] কিন্তু এই ক্ষত্রিয় কি বর্ণ অর্থে ক্ষত্রিয়? রাজা-রাজন্য মাত্রই তো ক্ষত্রিয়; সমসাময়িক কালে সব রাজবংশই তো ক্ষত্রিয় বলিয়া নিজেদের দাবি করিয়াছে, এবং একে অন্যের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। রাজা-রাজন্যের বিবাহ-ব্যাপারে কোনও বর্ণগত বাধা-নিষেধ কোনও কালেই ছিল না। তারানাথ তো বলিতেছেন গোপাল ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে জনৈক বৃক্ষদেবতার পুত্র[৩]; এ-গল্প নিঃসন্দেহে টটেম-স্মৃতিবহ! আবুল ফজল বলেন পাল রাজারা কায়স্থ[৪]; মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থ তাঁহাদের সোজাসুজি বলিয়াছে দাসজীবী[৫]। পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন, এবং মনে রাখা দরকার তারানাথ এবং মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার দুইজনই বৌদ্ধ। পালেরা যে বর্ণ-হিসাবে দ্বিজশ্রেণীর কেহ ছিলেননা, তারানাথ, আবুল ফজল এবং শেষোক্ত গ্রন্থের লেখক সকলের ইঙ্গিতই যেন সেই দিকে। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বর্ণের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছি না। তবে রাজা, রাণক, রাজন্যক প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয় বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন, এমন অনুমান অসম্ভব নয়, কিন্তু বর্ণ হিসাবে তাঁহারা যথার্থই

---

১ পাল পর্বের লিপিমালা দ্রষ্টব্য।

২ রামচরিত, ১।১৭ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩ Taranath's Geschichte der Buddhismus...p. 202.

৪ Ain-i-Akbari. Trs. Blochmann & Jarret, II, p. 145.

৫ Manjusrimulakalpa, ed. Jayaswal. v. p. 883.

ক্ষত্রিয় ছিলেন কিনা সন্দেহ। ক্ষত্রিয়-পরিবারে বিবাহ অনেক রাজাই করিয়াছেন, কিন্তু শুধু তাহাই ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞাপক হইতে পারে না।

করণ-কায়স্থদের অস্তিত্বের প্রমাণ অনেক পাওয়া যাইতেছে। রাম-চরিতের কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা ছিলেন "করণানামাগ্রণী", অর্থাৎ করণ কুলের শ্রেষ্ঠ[১]; তিনি ছিলেন পালরাষ্ট্রের সন্ধিবিগ্রহিক। শব্দপ্রদীপ নামে একখানি চিকিৎসা গ্রন্থের লেখক আত্মপরিচয় দিতেছেন "করণান্বয়", অর্থাৎ করণ-বংশজাত বলিয়া; তিনি নিজে রাজবৈদ্য ছিলেন, তাঁহার পিতা ও প্রপিতামহ যথাক্রমে পালরাজ রামপাল ও বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের রাজবৈদ্য ছিলেন[২]। ন্যায়কন্দলী-গ্রন্থের লেখক শ্রীধরের (৯৯১খ্রী) পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাণ্ডুদাস, তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে 'কায়স্থ কুলতিলক' বলিয়া[৩]। পাণ্ডুদাসের বাড়ী বাংলাদেশে বলিয়াই তো মনে হইতেছে, যদিও এসম্বন্ধে নিঃসংশয় প্রমাণ নাই। তিব্বতী গ্রন্থ পাগ্-সাম-জোন্-জা (Pag-Sam-Jon-Zang) পাল-সম্রাট ধর্মপালের এক কায়স্থ রাজকর্মচারীর উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহার নাম দঙ্গদাস[৪]। জড্ঢ নামে গৌড়দেশবাসী এক করণিক খাজুরাহোর একটি লিপির (৯৫৪) লেখক[৫]। যুক্তপ্রদেশের পিলিভিট্ জেলায় প্রাপ্ত দেবল প্রশস্তির (৯৯২)

---

১ রামচরিত, কবিপ্রশস্তি, ৩নং শ্লোক।

২ Eggeling, Cat. of Sans. Mss. in the Library of the India Office, London. 1887. v. p. 974

৩ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড; JASB. 1912. p. 341.

৪ Ed. S. C. Das, Intro. p. iii; দুই পৃষ্ঠা পরেই এক কায়স্থ-বৃদ্ধের উল্লেখ আছে এই গ্রন্থে।

৫ Ep. Ind. I. p. 122

লেখক তক্ষাদিত্যও ছিলেন একজন গৌড়দেশবাসী করণিক[১]। চাহমান-রাজ রায়পালের নাডোল লিপির লেখক ছিলেন (১১৪১) ঠকুর পেথড নামে জনৈক গৌড়ান্বয় কায়স্থ[২], বীসলদেবের দিল্লী-শিবালিক স্তম্ভলিপির (১১৬৩) লেখক শ্রীপতিও ছিলেন একজন গৌড়ান্বয় কায়স্থ[৩]। সমসাময়িক উত্তর ও পশ্চিম ভারতে করণ-কায়স্থেরা পৃথক স্বতন্ত্র বর্ণ বা বংশ বলিয়া গণ্য হইত, এসম্বন্ধে অনেক লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। রাষ্ট্রকূট অমোঘবর্ষের একটি লিপিতে (নবম শতক) বলভ-কায়স্থ বংশের উল্লেখ, ১১৮৩ বা ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের একটি লিপিতে কায়স্থ বংশের উল্লেখ[৪], প্রভৃতি হইতে মনে হয় নবম-দশম-একাদশ শতকে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের সর্বত্রই কায়স্থরা বর্ণহিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাস্থ হইতে উদ্ভূত এই অর্থে বাস্তব্য কায়স্থের উল্লেখও একাধিক লিপিতে পাওয়া যাইতেছে; একাদশ শতকের আগে এই বাস্তব্য কায়স্থেরা কালঞ্জর নামক স্থানে বাস করিত, এই তথ্যও এই লিপিগুলি হইতে জানা যাইতেছে। বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত এই আমলের একটি লিপিতে[৫] পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে বাস্তব্য কায়স্থেরা করণবৃত্তি অনুসরণ করিত; এবং তাহাদের বর্ণ বা উপবর্ণকে যেমন বলা হইয়াছে কায়স্থ তেমনই বলা হইয়াছে করণ, অর্থাৎ করণ এবং কায়স্থ যে বর্ণহিসাবে সমার্থক ও অভিন্ন তাহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। নবম-দশম শতক নাগাদ বাংলাদেশেও করণ-কায়স্থেরা বর্ণহিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই সম্বন্ধে অন্তত একটি লিপিপ্রমাণ

১ Ep. Ind. I, p. 81

২ Ep. Ind. XI, p. 41

৩ Ind. Ant. XIX, p. 218

৪ Ep. Ind. XVIII, p 251, Proc. A. S. B. 1880, p 78

৫ Ep Ind. I, p 332

বিদ্যমান। শাকম্ভরীর চাহমানাধিপ দুর্লভরাজের কিনসরিয়া লিপির (৯৯৯) লেখক ছিলেন গৌড়দেশবাসী মহাদেব, মহাদেবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে "গৌড়কায়স্থবংশ" বলিয়া[১]।

কায়স্থদের বর্ণগত উদ্ভব সম্বন্ধে লিপিমালায় এবং অর্বাচীন স্মৃতি-গ্রন্থাদিতে নানা প্রকার কাহিনী প্রচলিত দেখা যায়। বেদব্যাস স্মৃতিমতে কায়স্থরা শূদ্রপর্যায়ভুক্ত[২]। উদয়সুন্দরীকথা-গ্রন্থের লেখক কবি সোঢ্ঢল (একাদশ শতক) কায়স্থবংশীয় ছিলেন[৩], তাঁহার যে বংশ-পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যায় কায়স্থরা ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়া দাবি করিতেন। ১০৪৯ খ্রীস্টাব্দের কলচুরীরাজ কর্ণের জনৈক কায়স্থ মন্ত্রীর একটি লিপিতে কায়স্থদের বলা হইয়াছে 'দ্বিজ' (৩৫ শ্লোক), অন্য স্থানে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে তাঁহারা ছিলেন শূদ্র[৪]। ব্রাহ্মণেরাও যে করণবৃত্তি গ্রহণ করিতেন তাহার একাধিক লিপি-প্রমাণ বিদ্যমান। ভাস্করবর্মণের নিধনপুর লিপি-কথিত জনৈক ব্রাহ্মণ জনার্দন স্বামী ছিলেন ন্যায়-করণিক। এই লিপিতে জনৈক কায়স্থ দুন্দুনাথেরও উল্লেখ আছে[৫]। উদয়পুরের গোড়লিপিতে (১১৭১) এক করণিক ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[৬]। করণিক শব্দ এইসব ক্ষেত্রে যে বৃত্তিবাচক সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; তবে, সাম্প্রতিক কালে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, বাংলার কায়স্থরা নাগর ব্রাহ্মণদের বংশধর, এবং এইসব

১ Ep. Ind. XII. p. 61

২ Kane, History of the Dharmasastras, p. 76.

৩ উদয়সুন্দরীকথা, Gaekwad Or. Ser. p. 11.

৪ Ep Ind. XXIV, p. 101

৫ কামরূপশাসনাবলী, পৃ ৪৩

৬ Bhandarkar, List of Inscriptions no. 350.

নাগর ব্রাহ্মণ পঞ্জাবের নগরকোট, গুজরাট-কাথিয়াবাড়ের আনন্দপুর (অন্য নাম নগর) প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন[১]। এই মত সকলে স্বীকার করেন না; এসম্বন্ধে একাধিক বিরুদ্ধ-যুক্তি যে আছে, সত্যই তাহা অস্বীকার করা যায় না[২]। বিদেশ হইতে নানাশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন, তাহার প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান; কিন্তু পৃথক পৃথক বর্ণস্তর গড়িয়া তুলিবার মতন এত অধিক সংখ্যায় তাঁহারা কখনও আসিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই।

পাল আমলের সুদীর্ঘ চারিশত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যত্র বৈদ্যবংশও পৃথক উপবর্ণ হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন স্মৃতি-গ্রন্থাদিতে বর্ণহিসাবে বৈদ্যের উল্লেখ নাই, অর্বাচীন স্মৃতি-গ্রন্থে চিকিৎসা-বৃত্তিধারী লোকদের বলা হইয়াছে বৈদ্যক। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ সমার্থক বলিয়া ধরা হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য দুই পৃথক উপবর্ণ বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে[৩]। ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার সহবাসে উৎপন্ন অম্বষ্ঠ সংকর বর্ণের উল্লেখ একাধিক স্মৃতি ও ধর্মসূত্র গ্রন্থে পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত অম্বষ্ঠ-বৈদ্যের অভিন্নতা পরবর্তী কালে বাংলাদেশে স্বীকৃত হইয়াছিল; চন্দ্রপ্রভা-গ্রন্থ এবং ভট্টিটীকার বৈদ্য লেখক ভরত মল্লিক (সপ্তদশ শতক) অম্বষ্ঠ এবং বৈদ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন[৪]। কিন্তু বাংলার বাহিরে সর্বত্র এই অভিন্নতা স্বীকৃত নয়; বর্তমান বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের কোনও কোনও

---

১ Ind. Ant., LXI, p. 48, I. H Q. VI, p. 60

২ HB. (D. U), p. 589.

৩ পরে দ্রষ্টব্য

৪ চন্দ্রপ্রভা, কলিকাতা সং

কায়স্থ সম্প্রদায় নিজেদের অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন; এবং অন্ততঃ একটি অর্বাচীন সংহিতায় (সূত-সংহিতা) অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যদের অভিন্ন বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, দক্ষিণতম ভারতে অষ্টম শতকেই বৈদ্য উপবর্ণের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। জনৈক পাণ্ড্যরাজার তিনটি লিপিতে[১] কয়েকজন বৈদ্য সামন্তের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজে সম্ভ্রান্ত ও পরাক্রান্ত বলিয়া গণিত হইতেন, তাহা বুঝা যাইতেছে। ইঁহাদের একজনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে বৈদ্য এবং "বৈদ্যকশিখামণি" বলিয়া; তিনি একজন প্রখ্যাত সেনানায়ক এবং রাজার অন্যতম উত্তরমন্ত্রী ছিলেন। আর একজনের জন্মের ফলে বঙ্গলবৈদ্যব (পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার ?) বৈদ্যকুল উজ্জ্বল হইয়াছিল; তিনি ছিলেন গীতবাদ্যে সুনিপুণ। আরও এক জনের পরিচয় বৈদ্যক হিসাবে; তিনি ছিলেন একাধারে কবি, বক্তা এবং শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। এই লিপিগুলির 'বৈদ্যকুল,' 'বৈদ্য' 'বৈদ্যক' শব্দগুলি ভিষক্‌বৃত্তিবাচক বলিয়া মনে হইতেছে না, এবং বৈদ্যকুল বলিতে যেন কোনো উপবর্ণই বুঝাইতেছে। বাংলার সমসাময়িক কোনো লিপি বা গ্রন্থে এই অর্থে বা অন্য কোনো অর্থে বৈদ্যক, বা বৈদ্যকবংশ বা বৈদ্যককুলের কোনো উল্লেখ নাই। বস্তুত, তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় পরবর্তী পাল ও সেন-বর্মণযুগে, একাদশ শতকের পাল লিপিতে দ্বাদশ শতকে শ্রীহট্টজেলায় রাজা ঈশান-দেবের ভাটেরা লিপিতে। ঈশানদেবের অন্যতম পট্টনিক বা মন্ত্রী বনমালী কর ছিলেন "বৈদ্যবংশ প্রদীপ"।[২] পূর্ববর্তী পাল-চন্দ্রযুগে বরং দেখিয়াছি শব্দপ্রদীপ গ্রন্থের লেখক, তাঁহার পিতা এবং

১ Ep. Ind. XVII, 291-309; VIII, 317-321. Ind. Ant., 1893, 57 pp.
২ Proc. A. S. B. 1880, 141 pp. Ep. Ind. XIX. 277 pp.

প্রপিতামহ যাহারা সকলেই ছিলেন রাজবৈদ্য বা চিকিৎসক তাঁহাদের আত্মপরিচয় 'করণ' বলিয়া। সেইজন্য মনে হয়, একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে, অন্ততঃ বাংলাদেশে, বৃত্তিবাচক বৈদ্য-বৈদ্যক শব্দ বর্ণ বা উপবর্ণ-বাচক বৈদ্য শব্দে বিবর্তিত হয় নাই অর্থাৎ বৈদ্যবৃত্তিধারীরা বৈদ্য-উপবর্ণে গঠিত ও সীমিত হইয়া উঠেন নাই। কিন্তু, পূর্বোক্ত পাণ্ড্য-রাজার একটি লিপিতে যে বঙ্গলগুের বৈদ্যকুলের কথা বলা হইয়াছে, এই বঙ্গলগুে কোথায়? এই বঙ্গলগুের সঙ্গে কি বঙ্গ-বঙ্গালজনের বা বঙ্গাল-দেশের কোনও সম্বন্ধ আছে? আমার যেন মনে হয়, আছে। এই বৈদ্যকুল বঙ্গ বা বঙ্গালদেশ (দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ) হইতে দক্ষিণ প্রবাসে যায় নাই তো? বাংলাদেশে বৈদ্যকুল এখনও বিদ্যমান; দক্ষিণতম ভারতে কিন্তু নাই, মধ্যযুগেও ছিল বলিয়া কোনো প্রমাণ নাই। তাহা ছাড়া পূর্বোক্ত তিনটি লিপিই একটি রাজার রাজত্বের, এবং যে-তিনটি বৈদ্য-প্রধানের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা যেন একই পরিবারভুক্ত। এইসব কারণে মনে হয়, বৈদ্যকুলের এই পরিবারটি বঙ্গ বা বঙ্গালদেশ হইতে দক্ষিণ ভারতে গিয়া হয়ত বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গলগুে হয়ত পাণ্ড্যদেশে বঙ্গ-বঙ্গাল দেশবাসীর একটি উপনিবেশ, অথবা একেবারে মূল বঙ্গ-বঙ্গালভূমি। যদি এই অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, অষ্টম শতকেই বাংলাদেশে বৈদ্য উপবর্ণ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

কৈবর্ত

পাল আমলে কৈবর্তদের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। বরেন্দ্রীর কৈবর্তনায়ক দিব্য বা দিব্বোক পালরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান সামন্ত কর্মচারী ছিলেন বলিয়া মনে হয়; অনন্তসামন্তচক্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পালরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপরায়ণ হইয়া রাজা দ্বিতীয় মহী-

পালকে হত্যা করেন, এবং বরেন্দ্রী কাড়িয়া লইয়া সেখানে কৈবর্তাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বরেন্দ্রী কিছুদিনের জন্য দিব্য, রুদোক ও ভীম পর পর এই তিন কৈবর্তরাজার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় সমসাময়িক উত্তরবঙ্গ-সমাজে কৈবর্তদের সামাজিক প্রভাব ও আধিপত্য, জনবল ও পরাক্রম যথেষ্টই ছিল। বিষ্ণুপুরাণে কৈবর্তদের বলা হইয়াছে অব্রহ্মণ্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সংস্কৃতি বহির্ভূত।[১] মনুস্মৃতিতে নিষাদ-পিতা এবং আয়োগব মাতা হইতে জাত সন্তানকে বলা হইয়াছে মার্গব বা দাস; ইহাদেরই অন্য নাম কৈবর্ত।[২] মনু বলিতেছেন, ইঁহাদের উপজীবিকা নৌকার মাঝিগিরি। এই দুইটি প্রাচীন সাক্ষ্য হইতেই বুঝা যাইতেছে, কৈবর্তরা কোনও আর্যপূর্ব কোম বা গোষ্ঠী ছিল, এবং তাহারা ক্রমে আর্য-সমাজের নিম্নস্তরে স্থানলাভ করিতেছিল। বৌদ্ধ জাতকের গল্পেও মৎস্যজীবিদের বলা হইয়াছে কেবত্ত = কেবর্ত।[৩] আজ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের কৈবর্তরা নৌকাজীবী মৎস্যজীবী। দ্বাদশ শতকে বাঙালী স্মৃতিকার ভবদেব ভট্ট সমাজে কেবর্তদের স্থান নির্দেশ করিতেছেন অন্ত্যজ পর্যায়ে, রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, মেদ এবং ভিল্লদের সঙ্গে[৪]; এবং স্মরণ রাখা প্রয়োজন ভবদেব রাঢ়দেশের লোক। অমরকোষেও দেখিতেছি, দাস ও ধীবরদের বলা হইতেছে কৈবর্ত। মনুস্মৃতি এবং বৌদ্ধজাতকের সাক্ষ্য একত্র যোগ করিলেই অমকোষের সাক্ষ্যের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। দ্বাদশ শতকের গোড়ায় ভবদেব ভট্টের সাক্ষ্য ও প্রামাণিক। স্পষ্টই দেখা

১ ৪।২৪।৮

২ ১০।৩৪

৩ Rhys Davids, Buddhist India; Fick, Social Organisation.

৪ প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, ১১৮ পৃ।

যাইতেছে, ঐ সময়েও কৈবর্তদের সঙ্গে মাহিষ্যদের যোগাযোগের কোনও সাক্ষ্য উপস্থিত নাই ; এবং মাহিষ্য বলিয়া কৈবর্তদের পরিচয়ের কোনও দাবিও নাই, স্বীকৃতিও নাই। পরবর্তী পর্বে সেই দাবি এবং স্বীকৃতির স্বরূপ ও পরিচয় পাওয়া যাইবে ; কিন্তু এই পর্বে নয়। কৈবর্তদের জীবিকাবৃত্তি যাহাই হউক, পালরাষ্ট্রের উদার সামাজিক আদর্শ কৈবর্তদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভ ও সঞ্চয়ের পথে কোনও বাধার সৃষ্টি করে নাই , করিলে দিব্য এত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতে পারিতেন না। সন্ধ্যাকরনন্দী পালরাষ্ট্রের প্রসাদভোজী, রামপালের কীর্তিকথার কবি, তিনি দিব্যকে দস্যু বলিয়াছেন, উপধিব্রতী বলিয়াছেন, কুৎসিত কৈবর্ত নৃপ বলিয়াছেন, তাঁহার বিদ্রোহকে অলীক ধর্মবিপ্লব বলিয়াছেন, এই ডমর উপপ্লবকে 'ভবস্য আপদম' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—শত্রু এবং শত্রুবিদ্রোহকে পক্ষপাতী লোক তাহা বলিয়াই থাকে—কিন্তু কোথাও তাঁহার বা তাঁহার শ্রেণীর বৃত্তি বা সামাজিক স্থান সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত তিনি করেন নাই। মনে হয়, সমাজে তাঁহাদের বৃত্তি বা স্থান কোনটাই নিন্দনীয় ছিল না। কৈবর্তরা যে মাহিষ্য, এ-ইঙ্গিতও সন্ধ্যাকর কোথাও দিতেছেন না। একাদশ-দ্বাদশ শতকেও কৈবর্তরা বাংলাদেশে কেবট্ট বলিয়া পরিচিত হইতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ কেহ কেহ সংস্কৃতচর্চা করিতেন, কাব্যও রচনা করিতেন, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির ভক্ত অনুরাগী ছিলেন। 'সদুক্তি কর্ণামৃত' নামক কাব্যসংকলন গ্রন্থে (১২০৬) কেবট্ট পপীপ অর্থাৎ কেওট বা কৈবর্ত কবি পপীপ রচিত গঙ্গাস্তবের একটি পদ আছে। পদটি বিনয়-মধুর, সুন্দর !

বর্ণসমাজের নিম্নস্তর

পালরাজাদের অধিকাংশ লিপিতে সাময়িক বর্ণসমাজের নিম্নতম-

স্তবের কিছু পরোক্ষ সংবাদ পাওয়া যায়। লিপিগুলির যে অংশে ভূমি দানের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইতেছে সেখানে রাজপাদোপজীবী বা রাজ-কর্মচারীদের সুদীর্ঘ তালিকার পরেই উল্লেখ করা হইতেছে ব্রাহ্মণদের, তাহার পরে প্রতিবাসী ও ক্ষেত্রকর বা কৃষকদের, এবং কুটুম্ব অর্থাৎ স্থানীয় প্রধান প্রধান গৃহস্থ লোকদের (লক্ষণীয় যে ক্ষত্রিয়বৈশ্যদের কোনও উল্লেখ নাই); ইহাদের পরই অন্যান্য যেসব স্তরের লোক তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া গাঁথিয়া উল্লেখ করা হইতেছে মেদ, অন্ধ্র ও চণ্ডালদের। চণ্ডালরাই যে সমাজের নিম্নতম স্তর তাহা লিপির এই অংশটুকু উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে: প্রতিবাসিনশ্চ ব্রাহ্মণোত্তরান্ মহত্তরকুটুম্বি-পুরোগমেদান্ধ্রকচণ্ডালপর্যান্তান্। ভবদেব ভট্টের স্মৃতিশাসনে চণ্ডাল অন্ত্যজ পর্যায়ের, চণ্ডাল ও অন্ত্যজ এই দুইই সমার্থক। মেদরাও ভবদেবের মতে অন্ত্যজ পর্যায়ের। মেদ ও চণ্ডালদের সঙ্গে অন্ধ্রদের উল্লেখ হইতে, মনে হয়, ইহাদেরও স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল বাঙালী সমাজের নিম্নতম স্তরে। কিন্তু, কেন এইরূপ হইয়াছিল, বুঝা কঠিন। বেতনভুক সৈন্য হিসাবে মালব খস কুলিক, হূণ, কর্ণাট, লাট প্রভৃতি বিদেশী ও ভিন্প্রদেশী অনেক লোক পালরাষ্ট্রের সৈন্যদলে ভর্তি হইয়াছিল; এই তালিকায় অন্ধ্রদের দেখা পাওয়া যায় না। ইহারা স্বভাবতঃ জীবিকার্জনের জন্য নিজের দেশ ছাড়িয়া বাংলাদেশে আসিয়া এদেশের বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিলেন, এবং সামাজিক দৃষ্টিতে হেয় বা নীচ এমন কোনও কাজ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন।

ইহাদের ছাড়া "চর্যাগীতি" বা "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" গ্রন্থে আরও কয়েকটি তথাকথিত নীচ জাতের খবর পাওয়া যাইতেছে, যথা ডোম বা ডোম্ব, চণ্ডাল, শবর ও কাপালি। ডোমপত্নী অর্থাৎ ডোমনী বা ডোম্বি ও

কাপালি বা কাপালিক সম্বন্ধে কাহ্নুপাদের একটি পদের কিয়দংশ উদ্ধার করা যাইতে পারে।১

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহেরি কুড়িআ (কুঁড়েঘর)।
ছোই ছোই জাই সো বাহ্মণ নাড়িআ (নেড়ে ব্রাহ্মণ) ॥
আলো (ওলো) ডোম্বি তোত্র সম করিব ম সঙ্গ।
নিঘিন (নিঘৃণ — ঘৃণা নাই যার) কাহ্ন কাপালি জোই (যোগী) লাংগ (উলঙ্গ) ॥···
তান্তি (তাঁত) বিকণঅ ডোম্বি অরবনা চাংগেড়া (বাঁশের চাঙ্গাড়ি)।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া ॥

ডোমেরা যে সাধারণতঃ নগরের বাহিরে কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করিত, বাঁশের তাঁত ও চাঙাড়ি তৈরি করিয়া বিক্রয় করিত, এবং ব্রাহ্মণস্পর্শ যে তাহাদের নিষিদ্ধ ছিল, এই পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ডোম পুরুষ ও নারী নৃত্যগীতে সুপটু ছিল। কপালী বা কাপালি(ক)রাও নিম্নস্তরের লোক বলিয়া গণ্য হইত ; এই পদে তাহারও ইঙ্গিত বিদ্যমান। ভবদেব ভট্ট চণ্ডাল ও পুক্কশদের সঙ্গে কাপালিকদেরও অন্ত্যজ পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কাপালিকরা ছিল লজ্জাঘৃণাবিরহিত, গলায় পরিত হাড়ের মালা, দেহগাত্র থাকিত প্রায় উলঙ্গ। শবরেরা বাস করিত পাহাড়ে জঙ্গলে, ময়ূরের পাখ্ ছিল তাহাদের পরিধেয়, গলায় গুঞ্জা বীচির মালা, কর্ণে বজ্রকুণ্ডল।২

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥···

১ চর্যাপদ ১০ নং।

২ চর্যাপদ, ২৮ নং।

একেলী শবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী !
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবোর ভুজঙ্গ নৈরামণি দাবী পেক্ষরাতি পোহাইলী ॥

শবর-শবরীদের গানের একটা বিশিষ্ট ধরণ ছিল; সেই ধরণ শবরী-রাগ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কয়েকটি চর্যাগীতি যে এই শবরী রাগে গীত হইত সে-প্রমাণ এই গ্রন্থেই পাওয়া যাইতেছে। এই চর্যাগীতিটির মধ্যেই আমরা বজ্রযান বৌদ্ধদেবতা পর্ণশবরীর রূপাভাস পাইতেছি, এ-তথ্যের ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট। একাধিক চর্যাগীতির ইঙ্গিতে মনে হয় ডোম্ব ও চণ্ডাল অভিন্ন (১৮ ও ৪৭ সংখ্যক পদ) কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ডোম ও চণ্ডাল উভয়ই অন্ত্যজ অস্পৃশ্য পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে উল্লিখিত। চর্যাপদের সাক্ষ্য হইতে এই ধারণা করা চলে যে সমাজের উচ্চতর শ্রেণী ও বর্ণের দৃষ্টিতে ইহাদের যৌনাদর্শ ও অভ্যাস শিথিল ছিল। পরবর্তী পর্বে দেখা যাইবে, এই শৈথিল্য উচ্চশ্রেণীর ধর্মকর্মকেও স্পর্শ করিয়াছিল। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপের পোড়ামাটির ফলকগুলিতে বাঙালীসমাজের নিম্নস্তরের এইসব গোষ্ঠী ও কোমদের দৈহিক গঠনাকৃতি ও দৈনন্দিন আহারবিহার বসনব্যসনের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। বৃক্ষপত্রের পরিধান, গলায় গুঞ্জাবীচির মালা, এবং পাতা ও ফুলের নানা অলঙ্কার দেখিলে শবরী মেয়েদের চিনিয়া লইতে দেরী হয় না।

ব্রাহ্মণ

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বের ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য বর্ণ উপবর্ণ সম্বন্ধে যে-সব সংবাদ পাওয়া যায় তাহা একত্রে গাঁথিয়া মোটামুটি একটা চিত্র দাঁড় করাইবার চেষ্টা করা গেল। দেখা যাইতেছে এ-যুগের রাষ্ট্রদৃষ্টি

বর্ণসমাজের নিম্নতম স্তর চণ্ডাল পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-সমাজের মাপকাঠি ব্রাহ্মণ স্বয়ং এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও ধর্ম। সমাজে ইহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিস্তার ও গভীরতার দিকে তাকাইলেই বর্ণসমাজের ছবি স্পষ্টতর ধরিতে পারা যায়। এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের পৃষ্টপোষকতার তারতম্য এবং বিশিষ্টতা অনেকাংশে কোন বিশেষ ধর্ম ও ধর্মগত সংস্কার ও সমাজব্যবস্থার প্রসারতার দ্যোতক।

পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতি প্রসার আগেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সমাজে ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেছিল। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ ও মঞ্জুশ্রীমূল কল্পের গ্রন্থকার শশাঙ্ককে বলিয়াছেন বৌদ্ধবিদ্বেষী। সত্যই শশাঙ্ক তাহা ছিলেন কিনা সে-বিচার এখানে অবান্তর। এই দুই সাক্ষ্যের একটু ক্ষীণ প্রতিধ্বনি নদীয়া বঙ্গসমাজের কুলজী গ্রন্থেও আছে, এবং সেই সঙ্গে আছে শশাঙ্ক কর্ত্তৃক সরযূনদীর তীর হইতে বারোজন ব্রাহ্মণ আনয়নের গল্প। শশাঙ্ক এক উৎকট ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন ; ব্যাধিমুক্তির উদ্দেশ্যে গৃহযজ্ঞ করিবার জন্যই এই ব্রাহ্মণ-দের আগমন। রাজানুরোধে এই ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে বসবাস আরম্ভ করেন এবং গৃহবিপ্র নামে পরিচিত হন ; পরে তাঁহাদের বংশধরেরা রাঢ়ে-বঙ্গেও বিস্তৃত হইয়া পড়েন এবং নিজ নিজ গাঞী নামে পরিচিত হন। বাংলার বাহির হইতে ব্রাহ্মণাগমনের যে ঐতিহ্য কুলজীগ্রন্থে বিধৃত তাহার সূচনা দেখিতেছি শশাঙ্কের সঙ্গে জড়িত। কুলজীগ্রন্থের অন্য অনেক গল্পের মত এই গল্পও হয়তো বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু এই ঐতিহ্য-ইঙ্গিত সর্বথা মিথ্যা না-ও হইতে পারে। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার বলিতেছেন, শশাঙ্ক ছিলেন ব্রাহ্মণ ; ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণ্যপ্রীতি কিছু অস্বাভাবিক নয়, এবং বহুযুগস্মৃত শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ কাহিনীর

মূলে এতটুকু সত্যও নাই, এ-কথাই বা কি করিয়া বলা যায়। সমসাময়িক কাল যে প্রাগ্রসরমান ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিরই কাল তাহা ত নানাদিক হইতে সুস্পষ্ট। আগেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। য়ুয়ান্ চোয়াঙ্, ইৎসিঙ্, সেংচি প্রভৃতি চীন ধর্মপরিব্রাজকেরা যে সব বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে অনুমান করা চলে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির অবস্থাও বেশ সমৃদ্ধই ছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির অবস্থা তাহার চেয়েও অনেক বেশী সমৃদ্ধতর ছিল। বাংলার সর্বত্র ব্রাহ্মণ দেবপূজকের সংখ্যা সৌগতদের সংখ্যাপেক্ষা অনেক বেশি ছিল, এতথ্য য়ুয়ান্-চোয়াঙই রাখিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারের তথা বর্ণব্যবস্থার প্রসার বাড়িয়াই চলিযাছিল, এ সম্বন্ধে দেবদেবীর মূর্তি-প্রমাণই যথেষ্ট। জৈন ধর্ম ও সংস্কার তো ধীরে ধীরে বিলীন হইয়াই যাইতেছিল। আর, বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কারও ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শকে ধীরে ধীরে স্বীকার করিয়া লইতেছিল, পাল-চন্দ্র-কম্বোজ রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শের দিকে তাকাইলেই তাহা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ কামরূপ প্রসঙ্গে বলিতেছেন, কামরূপের অধিবাসিরা দেবপূজক ছিল, বৌদ্ধধর্মে তাহারা বিশ্বাস করিত না; দেবমন্দির ছিল শত শত, এবং বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের লোকসংখ্যা ছিল অগণিত। মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি বৌদ্ধ ছিল তাহারা ধর্মানুষ্ঠান করিত গোপনে। এই ত সপ্তমশতক কামরূপের অবস্থা; বাংলা দেশেও তাহার স্পর্শ লাগে নাই, কে বলিবে? মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার স্পষ্টই বলিতেছেন, মাৎস্যন্যায়ের পর গোপালের অভ্যুদয় কালে সমুদ্রতীর পর্যন্ত স্থান তীর্থিক (ব্রাহ্মণ?) দের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল; বৌদ্ধমঠগুলি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, লোকে ইহাদেরই ইটকাঠ কুড়াইয়া লইয়া ঘরবাড়ী তৈয়ার করিতেছিল। ছোটবড় ভূস্বামীরাও

তখন অনেকে ব্রাহ্মণ। গোপাল নিজেও ব্রাহ্মণানুরক্ত, এবং বৌদ্ধ গ্রন্থকার সেজন্য গোপালের উপর একটু কটাক্ষপাতও করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্রমবর্দ্ধমান প্রসার ও প্রভাব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই আর করা চলে না।

পালরাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ যুগের সমসাময়িক অবস্থাটা দেখা যাইতে পারে। এ-তথ্য সুবিদিত যে পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন—পরম সুগত। বৌদ্ধ-ধর্মের তাঁহারা পরম পৃষ্ঠপোষক; ওদন্তপুরী, সোমপুর এবং বিক্রমশীল মহাবিহারের তাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, নালন্দা-মহাবিহারের তাঁহারা ধারক ও পোষক; বজ্রাসনের বিপুল করুণা পরিচালিত দলবল পাল রাষ্ট্রের রক্ষক। বাংলাদেশে যত বৌদ্ধ মূর্তি ও মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রায় সমস্তই এই যুগের; যত অসংখ্য বিহারের উল্লেখ পাইতেছি নানা জায়গায় জগদ্দল বিক্রমপুরী-ফুল্লহরি-পট্টিকেরক-দেবীকোটপণ্ডিত-ত্রৈকূটক-পণ্ডিতসন্নগর—এই সমস্ত বিহারও এই যুগের; দেশ-বিদেশ-প্রখ্যাত যে বৌদ্ধ পণ্ডিতাচার্যদের উল্লেখ পাইতেছি তাঁহারাও এই যুগের। চন্দ্রবংশও বৌদ্ধ; জিন (বুদ্ধ), ধর্ম ও সংঘের স্বস্তি উচ্চারণ করিয়া চন্দ্র-বংশীয় লিপিগুলির সূচনা; ইঁহাদের রাজ্য হরিকেল তো বৌদ্ধতান্ত্রিক পীঠগুলির অন্যতম পীঠ। ভিন্ন-প্রদেশাগত কম্বোজ রাজবংশও বৌদ্ধ, পরমসুগত।

অথচ ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সমাজাদর্শ একান্তই ব্রাহ্মণ্য সংস্কারা-নুসারী, ব্রাহ্মণ্যাদর্শানুযায়ী। এই যুগের লিপিগুলি ত প্রায় সবই ভূমি-দান সম্পর্কিত; এবং প্রায় সর্বত্রই ভূমিদান লাভ করিতেছেন ব্রাহ্মণেরা, এবং সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণদের সম্মাননা না করিয়া কোন দানকার্যই সম্পন্ন

হইতেছে না। তাঁহাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি রাষ্ট্রের ও সমাজের সর্বত্র। "হরিচরিত" নামক গ্রন্থের লেখক চতুর্ভুজ বলিতেছেন, তাঁহার পূর্বপুরুষেরা বরেন্দ্রভূমির করঞ্জগ্রাম ধর্মপালের নিকট হইতে দানস্বরূপ লাভ করিয়া ছিলেন। এই গ্রামের ব্রাহ্মণেরা বেদবিদ্যাবিদ্ এবং স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন।[১] এই ধর্মপাল প্রসিদ্ধ পাল-নরপতি হওয়াই সম্ভব, যদিও কেহ কেহ মনে করেন ইনি রাজেন্দ্রচোল-পরাজিত ধর্মপাল। বৌদ্ধ নরপতি শূরপাল (প্রথম বিগ্রহপাল) মন্ত্রী কেদারমিশ্রের যজ্ঞস্থলে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অনেকবার শ্রদ্ধাসলিলাপ্লুতহৃদয়ে নতশিরে পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাদল প্রস্তরলিপিতে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রীবংশের প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে ; এই বংশের তিনপুরুষ বংশপরম্পরায় পালরাষ্ট্রের মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন। দর্ভপাণিপুত্র মন্ত্রী কেদারমিশ্র সম্বন্ধে এই লিপিতে আরও বলা হইয়াছে, "তাঁহার [হোমকুণ্ডোত্থিত] অবক্রভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নিশিখাকে চুম্বন করিয়া দিকচক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত।" তাহা ছাড়া তিনি চতুর্বিদ্যা-পয়োনিধি পান করিয়াছিলেন (অর্থাৎ চারি বেদবিদ ছিলেন)। কেদারমিশ্রের পুত্র মন্ত্রী গুরবমিশ্রের "বাগ্‌বৈভবের কথা, আগমে ব্যুৎপত্তির কথা, নীতিতে পরম নিষ্ঠার কথা...জ্যোতিষে অধিকারের কথা এবং বেদার্থচিন্তাপরায়ণ অসীম তেজসম্পন্ন তদীয় বংশের কথা ধর্মাবতার ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।" পরমসুগত প্রথম মহীপাল বিষুবসংক্রান্তির শুভতিথিতে গঙ্গাস্নান করিয়া এক ভট্ট ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালও আমগাছি লিপিদ্বারা এক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন।

---

১ Sastri, H. P.—Cat of Mss. Nepal. 1, 134 p ; হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২য় খণ্ড, ২০৮ পৃ ; যতীন্দ্র মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১০৭পৃঃ।

মদনপালের মহনলি লিপিতে বলা হইয়াছে, শ্রীবটেশ্বর স্বামীশর্মা বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত পাঠ করায় মদনপালের পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকা ভগবান বুদ্ধভট্টারককে উদ্দেশ্য করিয়া অনুশাসন দ্বারা বটেশ্বরকে নিষ্কর গ্রাম দান করিয়াছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রীর অন্তর্গত ভাবগ্রামে ভরত নামক ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; "তাঁহার যুধিষ্ঠির নামক বিপ্র (কুল) তিলক পণ্ডিতাগ্রগণ্য পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞানপরিশুদ্ধবুদ্ধি এবং শ্রোত্রিয়ত্বের সমুজ্জ্বল যশোনিধি ছিলেন।" যুধিষ্ঠিরের পুত্র ছিলেন দ্বিজাধীশ-পূজ্য শ্রীধর। তীর্থভ্রমণে, বেদাধ্যয়নে, দানাধ্যাপনায়, যজ্ঞানুষ্ঠানে, ব্রতাচরণে, সর্বশ্রোত্রীয়শ্রেষ্ঠ শ্রীধর প্রাতঃ, নক্ত, অযাচিত এবং উপবসন (নামক বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধন) করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন, এবং কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডবিৎ পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য, সর্বাকার-তপোনিধি এবং শ্রৌতস্মার্তশাস্ত্রের গুপ্তার্থাবিৎ বাগীশ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পবিত্র ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব কুমারপাল-মন্ত্রী বৈদ্যদেব বৈশাখে বিষুবসংক্রান্তি একাদশী তিথিতে ধর্মাধিকার পদাভিষিক্ত শ্রী গোনন্দন পণ্ডিতের অনুরোধে এই ব্রাহ্মণ শ্রীধরকে শাসনদ্বারা ভূমিদান করিয়াছিলেন। কিন্তু আর দৃষ্টান্ত উল্লেখের প্রয়োজন নাই; লিপিগুলিতে ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবী এবং মন্দির ইত্যাদির যে সব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারও আর বিবরণ দিতেছি না। বস্তুত, পালযুগের লিপিমালা পাঠ করিলেই এ-তথ্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে এইসব লিপির রচনা আগাগোড়া ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, রামায়ণ মহাভারতের গল্প, ভাবকল্পনা, এবং উপমালঙ্কার দ্বারা আচ্ছন্ন—ইহাদের ভাবাকাশ একান্তই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারের আকাশ। তাহা ছাড়া বৌদ্ধ পালরাষ্ট্র যে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও বর্ণব্যবস্থা পুরোপুরি স্বীকার করিত তাহার অন্ততঃ দুটি উল্লেখ পাল-লিপিতেই আছে।

দেবপালদেবের মুঙ্গের লিপিতে ধর্মপাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ধর্মপাল "শাস্ত্রার্থের অনুবর্তী শাসনকৌশলে (শাস্ত্রশাসন হইতে) বিচলিত (ব্রাহ্মণাদি) বর্ণসমূহকে স্ব স্ব শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মে প্রতিস্থাপিত করিয়াছিলেন"। এই শাস্ত্র যে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র এই সম্বন্ধে তো কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। স্ব স্ব ধর্মে প্রতিস্থাপিত করিবার অর্থও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসে প্রত্যেক বর্ণের যথানির্দিষ্ট স্থানে ও সীমায় বিন্যস্ত করা। মাৎস্যন্যায়ের পরে নূতন করিয়া শাস্ত্রশাসনানুযায়ী বিভিন্ন বর্ণগুলিকে সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজন বোধ হয় সমাজে দেখা দিয়াছিল। আমগাছি লিপিতেও দেখিতেছি তৃতীয় বিগ্রহপালকে "চাতুবর্ণ্য-সমাশ্রয়" বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

চন্দ্র ও কম্বোজ রাজ্যের সামাজিক আদর্শ

পালরাষ্ট্র সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, চন্দ্র ও কম্বোজরাষ্ট্র সম্বন্ধেও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য। বৌদ্ধ রাজা শ্রীচন্দ্র যথারীতি পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া কোটিহোমকর্তা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ত্রিঋষিপ্রবর শান্তিবারিক ব্রাহ্মণ পীতবাস গুপ্ত শর্মাকে ভূমিদান করিতেছেন, আর একবার এই রাজাই হোমচতুষ্টয়ক্রিয়াকালে অদ্ভুত-শান্তি নামক মঙ্গলানুষ্ঠানের পুরোহিত কাণ্বশাখীয় বার্দ্ধকৌশিকগোত্রীয় ত্রিঋষিপ্রবর শান্তিবারিক ব্রাহ্মণ ব্যাসগঙ্গশর্মাকে ভূমিদান করিতেছেন—উভয় ক্ষেত্রেই দানকার্যটি হইতেছে বুদ্ধভট্টারকের নামে এবং ধর্মচক্রদ্বারা শাসনখানা পট্টীকৃত করিয়া। কম্বোজরাজ পরমসুগত নয়পালদেব একটি গ্রাম দান করিতেছেন ভট্টদিবাকর শর্মার প্রপৌত্র, উপাধ্যায় প্রভাকর শর্মার পৌত্র এবং উপাধ্যায় অনুকূল মিশ্রের পুত্র, ভট্টপুত্র পণ্ডিত অশ্বত্থ শর্মাকে; এবং এই দানকার্যের যাঁহারা সাক্ষী তাঁহাদের মধ্যে পুরোহিত,

ঋত্বিক এবং ধর্মজ্ঞ অন্যতম। এই দুই রাষ্ট্রেই ঋত্বিক, ধর্মজ্ঞ, পুরোহিত, শান্তিবারিক ইত্যাদি ব্রাহ্মণেরা রাজপুরুষ, এই তথ্যও লক্ষণীয়।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শ

বস্তুতঃ, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। পূর্ব পূর্ব যুগে যাহাই হউক, এই যুগে সমাজ-ব্যবস্থা ব্যাপারে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণে কিছু পার্থক্য ছিল না। সামাজিক ব্যাপারে বৌদ্ধেরাও মনুর শাসন মানিয়া চলিতেন, ঠিক আজও বৌদ্ধধর্মানুসারী ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ সামাজিক শাসনানুশাসনের ক্ষেত্রে যেমন কতকটা ব্রাহ্মণ্য শাসনব্যবস্থা মানিয়া চলে। তারানাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস এবং অন্যান্য তিব্বতী বৌদ্ধগ্রন্থের সাক্ষ্য হইতেও অনুমান হয়, বর্ণাশ্রমী হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোন সামাজিক পার্থক্যই ছিল না। যাঁহারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন, বিহারে সংঘারামে বাস করিতেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম-শাসন প্রযোজ্য ছিল না, থাকিবার কোনও প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু যাঁহারা উপাসক মাত্র ছিলেন, গৃহী বৌদ্ধ ছিলেন তাঁহারা সাংসারিক ক্রিয়াকর্মে প্রচলিত বর্ণ-শাসন মানিয়াই চলিতেন। বৌদ্ধপণ্ডিতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতে ধর্ম ও সামাজিক মতামত লইয়া দ্বন্দ্ব-কোলাহলের প্রমাণ কিছু কিছু আছে, কিন্তু বৌদ্ধরা পৃথক সমাজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এমন কোনও প্রমাণ নাই। বরং সমসাময়িক কাল সম্বন্ধে তারানাথ এবং অন্যান্য বৌদ্ধ আচার্যরা যাহা বলিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, পালযুগের মহাযানী বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ তন্ত্রধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িতেছিল, এবং ধর্মাদর্শ ও ধর্মানুষ্ঠান, পূজাপ্রকরণ প্রভৃতি ব্যাপারে নূতন নূতন মত ও পথের উদ্ভব ঘটিতেছিল। তন্ত্র-ধর্মের স্পর্শে ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও অনুরূপ বিবর্তন ঘটিতেছিল, এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভেদ কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঘুচিয়া যাইতেছিল।

সমাজের গতি ও প্রকৃতি

ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাস পাল-চন্দ্র-কম্বোজ যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং বর্ণাশ্রম রক্ষণ ও পালনের দায়িত্ব এই যুগের বৌদ্ধরাষ্ট্রও স্বীকার করিত, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ সত্যই নাই। কিন্তু বর্ণবিন্যাস এবং প্রত্যেক বর্ণের সীমা পরবর্তী কালে যতটা দৃঢ়, অনমনীয় এবং নানা বিধিনিষেধের সূত্রে শক্ত ও সুনির্দিষ্ট রূপে বাঁধা পড়িয়াছিল, এই যুগে তাহা হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ, বাংলাদেশ তখনও পর্যন্ত তাহার নিজস্ব স্মৃতিশাসন গড়িয়া তোলে নাই; বস্তুত, স্মৃতিশাস্ত্র রচনার সূত্রপাতই তখনও হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই যুগের সব ক'টি রাষ্ট্র এবং রাজবংশই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধ সংস্কারাশ্রয়ী; ইঁহারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং ব্রাহ্মণ্য-সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও পালক হইলেও —হিন্দুরাষ্ট্রীয় আদর্শে রাজার অন্যতম কর্তব্যই প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ধারণ ও পালন—উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসন ইঁহাদের নিকট একান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ, পালরাজবংশ উচ্চবর্ণোদ্ভব নয়; বর্ণ-হিসাবে ইঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি "রামচরিত" ছাড়া আর কোথাও নাই, এবং তাহা রামপালের পিতা সম্বন্ধে। গোপাল বা ধর্মপাল বা দেবপাল সম্বন্ধে এ দাবি কেহ করে নাই; দশ-বার পুরুষ রাজত্ব করার পর একজন রাজা ও তাঁহার বংশ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইবেন ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। যাহাই হউক, পাল-বংশ উচ্চবর্ণোদ্ভব ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা বর্ণশাসনের স্মৃতি-সুলভ সুদৃঢ় আচার-বিচার বা স্তরউপস্তরভেদ সম্বন্ধে খুব নিষ্ঠাপরায়ণও ছিলেন না। চতুর্থতঃ, বাঙালী সমাজের অধিকাংশ লোকই তখনও বর্ণাশ্রম বহির্ভূত, অল্প সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত ছিল, যদিও তাহার সীমা ক্রমশই প্রসারিত হইয়া

চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান সীমার মধ্যে যাহারা আসিয়া অন্তর্ভূক্ত হইতেছিল তাহারা সকলেই আযপূর্ব কোম-সমাজের ও সেই সমাজগত সংস্কার ও সংস্কৃতির লোক। ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ব্যবস্থা, সংস্কার ও সংস্কৃতি তাহারা মানিয়া লইতেছিল অর্থনৈতিক আধিপত্যের চাপে পড়িয়া। ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসের সূত্রের মধ্যে তাহাদের গাঁথিয়া লওয়া খুব সহজ হয় নাই; অন্তত পাল ও চন্দ্ররাষ্ট্র সচেতন ও সক্রিয়ভাবে সেদিকে চেষ্টা কিছু করিয়াছিল বলিয়া তো মনে হয় না, প্রমাণও কিছু নাই। রাষ্ট্রীয় চাপ সেদিকে কিছু ছিল না; রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টিও এবিষয়ে উদার ছিল। আমার এই শেষোক্ত অনুমানের সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রমাণ কিছু নাই, তবে সমসময়িক রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় সমাজ-ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি যাহা হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক তাহাই অনুমানের রূপে ও আকারে ব্যক্ত করিলাম। হিন্দুধর্ম ও সমাজের স্বাঙ্গীকরণক্রিয়া আজও যে যুক্তিপদ্ধতি অনুসারে চলিতেছে বিভিন্ন আযপূর্ব গোষ্ঠী ও কোম গুলিতে, সেই যুক্তিপদ্ধতিই এই অনুমানের সাক্ষ্য ও সমর্থক। তাহা ছাড়া, এই অনুমানের পশ্চাতে রহিয়াছে, পরবর্তী যুগের বিশেষভাবে সেন-বর্মণ আমলের বাংলার বর্ণ ও সমাজ-বিন্যাসের ইতিহাস এবং বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য।

সেন-বর্মণ যুগ

পাল-চন্দ্ররাষ্ট্রে ও তাহাদের কালে ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসের আদর্শ ছিল উদারও নমনীয়; কম্বোজ সেন-বর্মণ আমলে সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের সক্রিয় সচেতন চেষ্টার ফলে সেই আদর্শ হইল সুদৃঢ়, অনমনীয় ও সুনির্দিষ্ট। যে বর্ণ-বিন্যস্ত সমাজব্যবস্থা আজও বাংলাদেশে প্রচলিত ও স্বীকৃত তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইল এই যুগে দেড় শতাব্দীর মধ্যে। বাংলার সমাজ ব্যবস্থার এই বিবর্তন প্রায় হাজার বৎসরের বাংলাদেশকে

ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইয়াছে। কি করিয়া এই আমূল সংস্কার, এত বড় পরিবর্তন সাধিত হইল তাহা একে একে দেখা যাইতে পারে।

কম্বোজ-রাজবংশকে অবলম্বন করিয়াই এই বিবর্তনের সূচনা অনুসরণ করা যাইতে পারে। এই পার্বত্য কোমটি বোধ হয় বাংলা দেশে আসার পর আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি আশ্রয় করেন। প্রথম রাজা রাজ্যপাল ছিলেন 'পরমসুগত' অর্থাৎ বৌদ্ধ; কিন্তু তাঁহার পুত্র নারায়ণ-পাল হইলেন বাসুদেবের ভক্ত। নারায়ণপালের ছোট ভাই সম্রাট নয়পাল একবার নবমী দিবসে পূজাস্নান করিয়া শঙ্কর ভট্টারকের (শিবের) নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে বর্ধমানভুক্তিতে কিছু ভূমি দান করেন। বৌদ্ধ রাজার বংশধরদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় লইতে দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় সমাজচক্র কোন্ দিকে ঘুরিতেছে। পালবংশের শেষের দিকেও একই চিহ্ন সুস্পষ্ট। শেষ অধ্যায়ে পালরাষ্ট্রও এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক-সমাজশাসনের স্পর্শে আসিয়াছিল। পালবংশ ও পাল-রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করিয়া সেনবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল; চন্দ্রবংশকে বিলুপ্ত করিয়া হইল বর্মনবংশের প্রতিষ্ঠা। যে দুটি বংশ ও রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইল তাহারা উভয়েই বাঙালী ও বৌদ্ধ, এবং যে দুটি বংশ ও রাষ্ট্র নূতন প্রতিষ্ঠিত হইল তাহারা উভয়েই ভিন্ প্রদেশাগত। উভয়েই অত্যন্ত নৈষ্ঠিক ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি আশ্রয়ী। বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের দিক হইতে এই দু'টি তথ্যই অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক অর্থবহ।

সেন-রাজবংশ কর্ণাটাগত; তাঁহারা আগে ছিলেন ব্রাহ্মণ, পরে যোদ্ধৃবৃত্তি গ্রহণ করিয়া হইলেন ক্ষত্রিয়, এবং পরিচয় হইল ব্রহ্মক্ষত্র রূপে। বর্মণ-বংশ কলিঙ্গাগত বলিয়া অনুমিত, অন্ততঃ ভিন্ন প্রদেশী এবং

দক্ষিণাগত, সন্দেহ নাই ; এবং বর্ণহিসাবে ক্ষত্রিয়। দক্ষিণদেশ সাতবাহন এবং তৎপরবর্তী সালঙ্কায়ন, বৃহৎফলায়ন, আনন্দ, পল্লব, কদম্ব প্রভৃতি রাজবংশের সময় হইতেই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের কেন্দ্র, যাগযজ্ঞহোম প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্রাহ্মণ্য পূজানুষ্ঠানে গভীর বিশ্বাসী, এবং প্রচলিত বর্ণাশ্রমের উৎসাহী প্রতিপালক। দক্ষিণদেশের এই নিষ্ঠাপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার লইয়া সেন ও বর্মণ রাজবংশ বাংলা দেশে আসিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। দেখিতে দেখিতে বাংলা দেশ যাগযজ্ঞহোমক্রিয়ার ধূমে ছাইয়া গেল, নদ-নদীর ঘাটগুলি বিচিত্র পুণ্যস্নানার্থীর মন্ত্রগুঞ্জরণে মুখরিত হইয়া উঠিল, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা, বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠান দ্রুত প্রসারিত হইল। সহজ স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় এই দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয় নাই ; পশ্চাতে ছিল রাষ্ট্রের ও রাজবংশের সক্রিয় উৎসাহ, অমোঘ ও সচেতন নির্দেশ। এই যুগের লিপিমালা, অসংখ্য পুরাণ, স্মৃতি, ব্যবহার ও জ্যোতিষগ্রন্থ ইত্যাদিই তাহার প্রমাণ।

ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক স্মৃতিশাসনের সূচনা

লিপিপ্রমাণগুলিই আগে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্মন-বংশ পরম বিষ্ণুভক্ত। এই রাজবংশের যে বংশাবলী ভোজবর্মণের বেলাব লিপিতে পাওয়া যাইতেছে তাহার গোড়াতেই ঋষি অত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক নামের ছড়াছড়ি, ইঁহাদেরই বংশে নাকি বর্মণ পরিবারের অভ্যুদয়। রাজা জাতবর্মণ অনেক দেশ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যকেও পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া :দাবি করিয়াছেন। এই দিব্য যে বরেন্দ্রীর কৈবর্তনায়ক দিব্য ইহা বহুদিন স্বীকৃত হইয়াছে। দিব্যর সৈন্য আক্রমণকালে জাতবর্মণকে নিশ্চয়ই উত্তরবঙ্গে অভিযান করিতে হইয়াছিল। এই অভিযানের একটু ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বোধ হয় নালন্দার

একটি লিপিতে পাওয়া যায়। সোমপুরের বৌদ্ধ মহাবিহার জাতবর্মণের সৈন্যরা পুড়াইয়া দিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। "সোমপুরের একটি বৌদ্ধ ভিক্ষুর গৃহ যখন বঙ্গাল-সৈন্যরা পুড়াইয়া দিতেছিল, ভিক্ষুটি তখন বুদ্ধের চরণ-কমল আশ্রয় করিয়া পড়িয়াছিলেন; সেইখানে সেই অবস্থাতেই তিনি স্বর্গত হইলেন।" বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের প্রতি বর্মণ-রাষ্ট্রের মনোভাব কিরূপ ছিল এই ঘটনা হইতে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শুধু মাত্র এই ঘটনাটি হইতেই এতটা অনুমান নিশ্চয়ই করা চলিত না; কিন্তু যুগ্-মনোভাবটাই ছিল এইরূপ। পরবর্তী সাক্ষ্য হইতে ক্রমশঃ তাহা আরও সুস্পষ্ট হইবে। এই বর্মণ রাষ্ট্রেরই অন্যতম মন্ত্রী স্মার্ত ভট্ট ভবদেব অগস্ত্যের মত বৌদ্ধ-সমুদ্রকে গ্রাস করিয়াছিলেন, এবং পাষণ্ডবৈতণ্ডিকদের (বৌদ্ধদের নিশ্চয়ই, নাথপন্থীরাও বটে) যুক্তিতর্ক খণ্ডনে অতিশয় দক্ষ ছিলেন বলিয়া গব অনুভব করিয়াছেন। সেই রাষ্ট্রের সৈন্যরা যুদ্ধব্যপদেশে বৌদ্ধবিহারও ধ্বংস করিবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়! জাতবর্মণের পরবর্তী রাজা সামলবর্মদেব কুলজীগ্রন্থের রাজা শ্যামলবর্মণ; স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই শ্যামলবর্মণের নামের সঙ্গেই এবং অন্যমতে তাঁহারই পূর্ববর্তী রাজা হরিবর্মণের সঙ্গে কান্যকুব্জাগত বৈদিক ব্রাহ্মণদের শকুনসত্র যজ্ঞের কিংবদন্তী জড়িত। সামলবর্মণের পুত্র ভোজবর্মণ সাবর্ণ গোত্রীয়, ভৃগু-চ্যবন-আপ্নুবান-ঔর্ব-জমদগ্নি প্রবর, বাজসনেয় চরণ এবং যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখ, শান্ত্যাগারাধ্যক্ষ ব্রাহ্মণ রামদেবশর্মাকে পৌণ্ড্রভুক্তিতে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। রামদেব শর্মার পূর্বপুরুষ মধ্যদেশ হইতে আসিয়া উত্তর-রাঢ়ার সিদ্ধলগ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সিদ্ধল-গ্রামে সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের বসতির কথা বর্মণ-রাজ হরিবর্মণ-দেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের লিপিতেও দেখা যাইতেছে। এই লিপিতে সমসাময়িক কালের ভাবাদর্শ, সমাজ ও শিক্ষাদর্শ, বর্ণ-ব্যবস্থা ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক

খবর পাওয়া যায়। ভবদেবের মাতা সাঙ্গোক ছিলেন জনৈক বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের কন্যা। এই সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের "গাঞী"-পরিচয় বিভাগ সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিযাছে, এ সম্বন্ধে আর তাহা হইলে কোনও সন্দেহই রহিল না। ভবদেব সমসাময়িক কালের বাঙালী চিন্তানায়কদের অন্যতম; তিনি ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্, সিদ্ধান্ত-তন্ত্র-গণিত-ফলসংহিতায় সুপণ্ডিত, হোরা শাস্ত্রের একটি গ্রন্থের লেখক, কুমারিলভট্টের মীমাংসাগ্রন্থের টীকাকার, স্মৃতি-গ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, আগমশাস্ত্র এবং অস্ত্রবেদেও তিনি সুপণ্ডিত। রাঢদেশে তিনি একটি নারায়ণ মন্দির স্থাপন করিয়া তাহাতে নারায়ণ, অনন্ত এবং নৃসিংহের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিযাছিলেন। কুমারিলভট্টের তন্ত্রবার্তিক নামক মীমাংসাগ্রন্থের ভবদেবকৃত তৌতাতিতমত-তিলক নামক টীকাগ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ আজও বর্তমান। তাঁহার কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি বা দশকর্মপদ্ধতি ও প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ নামক দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ আজও প্রচলিত। পরবর্তী বাঙালী স্মৃতি ও মীমাংসা লেখকেরা ভবদেবের উক্তি ও বিচার বারবার আলোচনা করিয়াছেন। বাঙালীর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ বিভিন্ন বর্ণের বিচিত্র স্তর উপস্তর বিভাগের সীমা উপসীমা, প্রত্যেকের পারস্পরিক আহার বিহার, বিবাহ ব্যাপারে নানা বিধি নিষেধ, এক কথায় সর্বপ্রকার সমাজকর্মের রীতিপদ্ধতি নিয়মবিধি সুনিদিষ্ট সূত্রে গ্রথিত হইয়া সমাজশাসনের একান্ত ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক, পুরোহিত-তান্ত্রিক নির্দেশ এই সর্বপ্রথম দেখা দিল। ভবদেবভট্ট পালযুগের শেষ আমলের লোক; এই সময় হইতেই এই একান্ত ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক সমাজশাসনের সূচনা এবং ভবদেবভট্টই তাহার আদিগুরু। বর্মণরাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়াই এই ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রসারিত হইতে আরম্ভ

করিল। ভূমি প্রস্তুত হইয়াই ছিল; রাষ্ট্রের সহায়তা এবং সক্রিয় সমর্থন পাইয়া সেই ভূমিতে এই শাসন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে বিলম্ব হইল না। এই শাসনের প্রথম কেন্দ্রস্থল হইল একদিকে রাঢ়দেশ, আর একদিকে বিক্রমপুর।

•

বর্মণরাষ্ট্রে যাহার সূচনা সেনরাষ্ট্রে তাহার প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মণ্য সমাজ এই সময় হইতেই আত্মসংরক্ষণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়কর্ম হইয়া উঠিল। এই সংরক্ষণী মনোবৃত্তির একটা কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। আগে দেখিয়াছি, ভবদেব ভট্ট বৌদ্ধদের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না; ইঁহাদের ও পাষণ্ডবৈতণ্ডিকদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ-তন্ত্রের সংরক্ষণী মনোবৃত্তি ভবদেবভট্টের রচনাতেই সুস্পষ্ট। সেন আমলে এই মনোবৃত্তি তীব্রতর হইয়া দেখা দিল। পাল আমলে বৌদ্ধ দেবদেবীরা কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিলেন, এবং শেষোক্ত দেবদেবীরাও বৌদ্ধ ও শৈবতন্ত্রে স্থান পাইতেছিলেন। বৌদ্ধসাধনমালায় ব্রাহ্মণ্য মহাকাল ও গণপতির স্থান, বৌদ্ধতন্ত্রে ব্রাহ্মণ্য লিঙ্গ এবং শৈব দেবদেবীদের স্থানলাভ এই যুগেই ঘটিয়াছিল। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযান ইত্যাদির আচারানুষ্ঠান, সাধনপদ্ধতি, সাধনাদর্শ প্রভৃতি ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাধনপদ্ধতি ও পূজানুষ্ঠান প্রভৃতিকে স্পর্শ করিতেছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিভূদের কাছে তাহা ভাল লাগিবার কথা নয়, বিশেষতঃ ভিন্নপ্রদেশাগত বর্মণ ও সেনারাষ্ট্রের প্রভুদের কাছে। বাংলাদেশের তন্ত্রধর্মের সমাজ-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞানও খুব সুস্পষ্ট থাকিবার কথা নয়। যে-ভাবেই হউক, সেন আমলের ব্রাহ্মণ্য সমাজ এইখানেই হয়ত ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা, এবং সমসাময়িককালের

ব্রাহ্মণ্যসমাজের সামাজিক নেতৃত্ব-হীনতার কারণ খুঁজিয়া পাইয়া থাকিবেন।

স্মৃতি ও ব্যবহার শাসনের বিস্তার

যাহাই হউক, ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র রচনাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মণ্যসমাজের এই সংরক্ষণী মনোবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করিল। আদি ধর্মশাস্ত্র লেখক জিতেন্দ্রিয় ও বালকের কোনও রচনা আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই; কিন্তু শুভাশুভকাল, প্রায়শ্চিত্ত, ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে এই দুজনেরই মতামত আলোচনা করিয়াছেন জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি পরবর্তী বাঙালী স্মার্ত ও ধর্মশাস্ত্র লেখকেরা। রাঢীয় ব্রাহ্মণ পারিভদ্রীয় গাঞী মহামহোপাধ্যায় জীমূতবাহনও এই যুগেরই লোক, এবং তিনি সুবিখ্যাত ব্যবহার মাত্রিকা, দায়ভাগ এবং কালবিবেক গ্রন্থের রচয়িতা। কুলজীগ্রন্থের মতে পারিহাল শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের অন্যতম গাঞী। জীমূতবাহনের পরেই নাম করিতে হয় বল্লালসেনের গুরু, হারলতা এবং পিতৃ-দয়িতা গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা অনিরুদ্ধভট্টের। তিনি শুধু মহামহোপাধ্যায় রাজগুরু ছিলেন না, সেনরাষ্ট্রের ধর্মাধ্যক্ষও ছিলেন। অনিরুদ্ধের বসতি ছিল বরেন্দ্রীর অন্তর্গত চম্পাহিটি গ্রামে, এবং তিনি চম্পাহিটি মহামহোপাধ্যায় আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। কুলজীগ্রন্থের মতে চম্পটি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বারেন্দ্র গাঞীদের অন্যতম গাঞী। অনিরুদ্ধশিষ্য রাজা বল্লালসেন স্বয়ং একাধিক স্মৃতিগ্রন্থের লেখক। তদ্রচিত আচারসাগর ও প্রতিষ্ঠাসাগর আজও অনাবিষ্কৃত; কিন্তু দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর বিদ্যমান। দানসাগর তিনি রচনা করিয়াছিলেন গুরু অনিরুদ্ধের আদেশে; অসম্পূর্ণ অদ্ভুতসাগর পিতার আদেশে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন পুত্র

লক্ষ্মণসেন। ছান্দোগ্য মন্ত্রভাষ্য রচয়িতা গুণবিষ্ণুও এই যুগের লোক। কিন্তু এই সব স্মৃতি-ব্যবহার-ধর্মশাস্ত্র রচয়িতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছেন ধর্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের পুত্র, লক্ষ্মণসেনের মহাধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ। হলায়ুধের এক ভাই ঈশান আহ্নিকপদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ এবং অপর ভ্রাতা পশুপতি দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন, একখানি শ্রাদ্ধপদ্ধতি এবং অন্য একখানি পাকযন্ত্র সম্বন্ধে। হলায়ুধ স্বয়ং সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ সর্বস্ব, মীমাংসা সর্বস্ব, বৈষ্ণব সর্বস্ব, শৈব সর্বস্ব এবং পণ্ডিত সর্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু আর নামোল্লেখের প্রয়োজন নাই। এক কথায় বলা যাইতে পারে, যে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও ব্যবহার শাসন পরবর্তীকালে শূলপাণি-রঘুনন্দন কর্তৃক আলোচিত ও বিধিবদ্ধ হইয়া আজও বাংলাদেশে প্রচলিত তাহার সূচনা এই যুগে—বর্মণ ও সেনরাষ্ট্রের ছত্রছায়ায়। এই যুগে রচিত স্মৃতি-ব্যবহার গ্রন্থগুলিতে ব্রাহ্মণসমাজের সংরক্ষণী মনোবৃত্তি সুস্পষ্ট। দন্তধাবন, আচমন, স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ, আহ্নিক, যাগযজ্ঞ, হোম, পূজানুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্মের শুভাশুভকালবিচার, অশৌচ, আচার, প্রায়শ্চিত্ত, বিচিত্র অপরাধ ও তাহার শাস্তি, কৃচ্ছ্র, তপস্যা, গর্ভধান-পুংসবন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, উত্তরাধিকার, স্ত্রীধন, সম্পত্তি-বিভাগ, আহার বিহারের বিচিত্র বিধিনিষেধ, বিচিত্র দানের বিবৃতি, দান-কর্মের বিচিত্রতর বিধিনিষেধ, তিথিনক্ষত্রের ইঙ্গিত বিচার, দৈবিক, বায়বিক ও পার্থিব বিচিত্র উৎপাত, লক্ষণাদির শুভাশুভ নির্ণয়, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রপাঠের নিয়ম ও কাল—এক কথায় দ্বিজবর্ণের জীবনশাসনের কোনও নির্দেশই এইসব গ্রন্থ হইতে বাদ পড়ে নাই। সমাজের বিচিত্র স্তর ও উপস্তরের, বিচিত্রতর বর্ণ ও উপবর্ণের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধের অসংখ্য বিধি-

নিষেধও এইসব স্মৃতিকর্তাদের আলোচনার বিষয়। শুধু তাহাই নয়, ইঁহাদের নির্দেশ অমোঘ ও সুনির্দিষ্ট। এই যুগের স্মৃতি-শাসনই পরবর্তী বাংলার ব্রাহ্মণতন্ত্রের ভিত্তি।

ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক সেনরাষ্ট্র

রাষ্ট্রে এই একান্ত ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক স্মৃতিশাসনের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। তাহা না হইবারও কারণ নাই, কারণ ভবদেবের বংশ, হলায়ুধের বংশ, অনিরুদ্ধ ইঁহারা তো সকলেই রাষ্ট্রেরই সৃষ্টি এবং সে রাষ্ট্রের নায়ক হরিবর্মন, সামল (শ্যামল) বর্মন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন। শেষোক্ত দুইজন তো নিজেরাই ভাবাদর্শে সমাজাদর্শে অনিরুদ্ধ-হলায়ুধের সমগোত্রীয়, নিজেরাই স্মৃতিশাসনের রচয়িতা। তাহা ছাড়া, শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারিধিকৃত, শান্তিবারিক, পুরোহিত, মহাপুরোহিত, ব্রাহ্মণ-রাজপণ্ডিত, ইঁহারা রাজপুরুষ হিসাবে স্বীকৃত হইতেছেন এই যুগেই—কম্বোজ-বর্মন-সেন রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রে ইঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িতেছে, ইঁহারা রাষ্ট্রের অজস্র কৃপালাভ করিতেছেন, নানা উপলক্ষ্যে অপরিমিত ভূমিদান ইঁহারাই লাভ করিতেছেন। কাজেই রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক স্মৃতিশাসনের প্রতিফলন দেখা যাইবে, ইহা তো বিচিত্র নয়।

বিজয়সেন ও বল্লালসেন উভয়েই ছিলেন পরম মাহেশ্বর অর্থাৎ শৈব; লক্ষ্মণসেন কিন্তু পরম বৈষ্ণব এবং পরম নারসিংহ (অর্থাৎ বৈষ্ণব); লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও কেশব উভয়েই সৌর অর্থাৎ সূর্যভক্ত। সেন-বংশের আদিপুরুষ সামন্তসেন শেষ বয়সে গঙ্গাতীরস্থ আশ্রমে বানপ্রস্থে কাটাইয়া ছিলেন; এইসব আশ্রম-তপোবন ঋষি-সন্ন্যাসী দ্বারা অধ্যুষিত এবং যজ্ঞাগ্নিসেবিতঘৃতধূমের সুগন্ধে পরিপূরিত থাকিত; সেখানে মৃগশিশুরা তপোবন-নারীদের স্তন্যদুগ্ধ পান করিত

এবং শুকপাখীরা সমস্ত বেদ আবৃত্তি করিত! কবিকল্পনা সন্দেহ নাই, কিন্তু বস্তুসম্পর্কবিহীন কবি-কল্পনাও রাষ্ট্রের সমাজাদর্শকেই ব্যক্ত করিতেছে এবং প্রাচীন তপোবনাদর্শের দিকে সমাজের মনকে প্রলুব্ধ করিবার, সেই স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, সে-বিষয়েও সন্দেহ নাই। সামন্তসেনের পৌত্র বিজয়সেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপর এত কৃপা বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং সেই কৃপায় তাঁহারা এত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পত্নীদিগকে নাগরিক রমণীরা মুক্তা, মরকত, মণি, রৌপ্য, রত্ন এবং কাঞ্চনের সঙ্গে কার্পাস বীজ, শাকপত্র, অলাবুপুষ্প, দাড়িম্ববীচি এবং কুষ্মাণ্ডলতাপুষ্পের পার্থক্য শিক্ষা দিত। যজ্ঞকার্যে বিজয়সেনের কখনও কোনও ক্লান্তি ছিল না। একবার তাঁহার মহিষী মহাদেবী বিলাসদেবী চন্দ্রগ্রহণের সময়ে কনক-তুলাপুরুষ অনুষ্ঠানের হোমকার্যের দক্ষিণাস্বরূপ রত্নাকর দেবশর্মার প্রপৌত্র, রহস্কর দেবশর্মার পৌত্র, ভাস্কর দেবশর্মার পুত্র, মধ্যদেশাগত, বৎসগোত্রীয়, ভার্গব-চ্যবন-আপ্লুবান-ঔর্ব-জামদগ্ন্য প্রবর, ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখার ষড়ঙ্গধ্যায়ী ব্রাহ্মণ উদয়কর দেবশর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। বল্লাল-সেনের নৈহাটিলিপি আরম্ভ হইয়াছে অর্দ্ধনারীশ্বরকে বন্দনা করিয়া; তাঁহার মাতা বিলাসদেবী একবার সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাতীরে হেমাশ্বমহাদান অনুষ্ঠানের দক্ষিণাস্বরূপ ভরদ্বাজ গোত্রীয়, ভরদ্বাজ-আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য প্রবর, সামবেদীয় কৌঠমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ শ্রীওবাসুদেবশর্মাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। বল্লালসেন এই লিপি দ্বারা এই দান অনুমোদিত ও পট্টিকৃত করেন। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া লিপির ভূমিদানগ্রহীতা হইতেছেন কৌশিক গোত্রীয়, বিশ্বামিত্র-বন্ধুল-কৌশিক প্রবর, যজুর্বেদীয় কান্বশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রঘুদেব শর্মণ। লক্ষ্মণসেন যে অসংখ্য ব্রাহ্মণকে ধান্যশস্যপ্রসূ উপবনসমৃদ্ধ বহু গ্রামদান

করিয়াছিলেন তাহাও এই লিপিতে উল্লিখিত আছে। এই রাজার গোবিন্দপুর পট্টোলির ভূমিদান গ্রহীতাও একজন ব্রাহ্মণ, উপাধ্যায় ব্যাসদেব শর্ম্মণ—বৎসগোত্রীয় এবং সামবেদীয় কৌঠমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী। এই ভূমিদান কার্য প্রথম করা হইয়াছিল লক্ষ্মণসেনের অভিষেক উপলক্ষে। সামবেদীয় কৌঠমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী, ভরদ্বাজ গোত্রীয় আর এক ব্রাহ্মণ ঈশ্বরদেবশর্ম্মণও কিছু ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন রাজা কর্তৃক হেমাশ্বরথমহাদান যজ্ঞানুষ্ঠানে আচার্যক্রিয়ার দক্ষিণা-স্বরূপ। এই ভূমির সীমানির্দেশ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, পূর্বদিকে বৌদ্ধ বিহারদেবতার এক আঢ়বাপ নিষ্কর ভূমির পূর্বসীমা আলি (বৌদ্ধ-বিহারী দেবতা নিকরদেয়ম্ মালভূম্যাঢাবাপ-পূর্বালিঃ)। সেন বংশের লিপিমালার মধ্যে এই একটি মাত্র স্থানে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ পাওয়া গেল; বরেন্দ্রীতে তাহা হইলে দ্বাদশ শতকের শেষপাদেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকাশ্য অস্তিত্ব ছিল। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর লিপি সর্বত্র সুস্পষ্ট ও সুপাঠ্য নয়; মনে হয় রাজা তাঁহার মূল অভিষেকের সময় ঐন্দ্রীমহাশান্তি যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে কৌশিকগোত্রীয়, অথর্ববেদীয় পৈপ্পলাদশাখাধ্যায়ী শান্ত্যাগারিক ব্রাহ্মণ গোবিন্দ দেবশর্মাকে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহাই এই শাসন দ্বারা অনুমোদিত ও পট্টিকৃত করা হইয়াছে। আর একবার এই রাজাই সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে জনৈক কুবের নামীয় ব্রাহ্মণকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। এই রাজার সুন্দরবন লিপিতেও কয়েক-জন শান্ত্যাগারিক ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের খবর পাওয়া যায়, যথা, প্রভাস, রামদেব, বিষ্ণুপাণি গড়োলী, কেশব গড়োলি এবং কৃষ্ণধর দেবশর্মা; ইঁহারা প্রত্যেকেই শান্ত্যাগারিক। শেষোক্তটি গার্গগোত্রীয় এবং ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়নশাখাধ্যায়ী। লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন ধান্য শস্যক্ষেত্র ও অট্টালিকা পূর্ণ বহু প্রসিদ্ধ গ্রাম ব্রাহ্মণদের দান

করিয়াছিলেন। তদনুষ্ঠিত যজ্ঞাগ্নির ধূম চারিদিকে এমন বিকীর্ণ হইত যেন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যাইত! তিনি একবার তাঁহার জন্মদিনে দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া একটি গ্রাম বাৎস্যগোত্রীয় নীতিপাঠক ব্রাহ্মণ ঈশ্বরদেবশর্মাকে দান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের আর এক পুত্র বিশ্বরূপসেন শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় বাৎস্য-গোত্রীয় নীতিপাঠক ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপ দেবশর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। এই রাজারই অন্য আর একটি লিপিতে দেখিতেছি হলায়ুধ নামে বাৎস্যগোত্রীয় যজুর্বেদীয়, কাণ্বশাখাধ্যায়ী জনৈক ব্রাহ্মণ আবল্লিক পণ্ডিত রাজপরিবারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের নিকট হইতে প্রচুর ভূমিদান লাভ করিতেছেন—উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশীতিথি, জন্মতিথি ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের দেববংশের লিপিগুলিতেও অনুরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী এবং বিষ্ণুভক্ত। এই বংশের অন্যতম রাজা দামোদর একবার জনৈক যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ পৃথ্বীধরশর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই বংশেরই আর একজন রাজা, অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীদশরথদেবের (=কুলজীগ্রন্থের দনুজমাধব=মুসলমান ঐতিহাসিকদের সোনারগাঁর রাজা, দনুজ রায়) আদাবাড়ী লিপি দ্বারা যে সমস্ত ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হইয়াছে তাহাদের গাঞী পরিচয় আছে; যথা, সন্ধ্যাকর, শ্রীমাক্রি (দিণ্ডী গাঞী), শ্রীশক্র, শ্রীসুগন্ধ (পালি গাঞী), শ্রীসোম (সিউ গাঞী), শ্রীবাদ্য (পালি গাঞী), শ্রীপণ্ডিত (মাসচটক গাঞী), শ্রীমাণ্ডী (মূল গাঞী), শ্রীরাম (দিণ্ডী গাঞী), শ্রীলেধু (সেহন্দায়ী গাঞী), শ্রীদক্ষ (পুতি গাঞী),

শ্রীভট্ট (সেউ-গাঞী.), শ্রীবালি (মহান্তিযাড়া গাঞী), শ্রীবাসুদেব (করঞ্জ গ্রামী, এবং শ্রীমিকো (মাসচডক গাঞী), ইত্যাদি। গাঞীপ্রথাব প্রচলন ভবদেবভট্টের কালেই আমরা দেখিয়াছি ; বোধ হয তাহারও বহু পূর্বে গুপ্ত আমলেই এই প্রথা প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে (গুপ্ত আমলের লিপিগুলিতে ভট্ট, বন্দ, চট্ট, প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য পদবী-পরিচয গাঞী-পরিচয় হওয়াই সম্ভব)। ত্রয়োদশ শতকে এই প্রথা একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আদাবাড়ী লিপির গাঞী তালিকায় বাঢ়ীয ও বারেন্দ্র উভয গাঞী পরিচয়ই মিলিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের প্রতি ব্রাহ্মণ-তন্ত্রের ব্যবহার

এই সুবিস্তৃত লিপি-সংবাদ হইতে কযেকটি তথ্য সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিতেছে। প্রথমত, বিভিন্ন বাষ্ট্রের ও রাজবংশের সুদীর্ঘ দান-তালিকায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংঘে একটি দানের উল্লেখও নাই। অথচ বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব তখনও ছিল, লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি লিপিতেই তাহার প্রমাণ আমরা দেখিয়াছি। তাহা ছাড়া রণবঙ্কমল্ল হরিকাল দেবের (১২২০) পট্টিকেরা লিপিও তাহার অন্যতম সাক্ষ্য ; এই লিপিতে হরিকাল কর্তৃক পট্টিকেরা নগরের এক বৌদ্ধবিহারে একখণ্ড ভূমিদানেব উল্লেখ আছে। এই লিপিতেই দুর্গোত্তারা নামক বৌদ্ধ দেবীমূর্তির এবং সহজধর্মেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।[১] আরও প্রমাণ আছে। পঞ্চরক্ষা নামক মহাযানগ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকা অংশে[২] "পরমেশ্বর পরমসৌগত-পরমমহারাজাধিরাজ শ্রীমন্ গৌড়েশ্বর-মধুসেন-দেবপাদানাং বিজয়রাজ্যে" উল্লেখ হইতে জানা যায

১ IHQ. IX, 282 pp.

২ Sastri H. P.—Cat of Mss. Nepal, I, 117 p, Mss. No, 4078.

১২১১ শকে (= ১২৮৯) মধুসেন নামক একজন বৌদ্ধ রাজা গৌড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। বর্মণরাষ্ট্রেও বৌদ্ধ মহাযান মতের অস্তিত্ব ছিল। "লঘু কালচক্র" নামক মহাযান গ্রন্থের "বিমলপ্রভা" নামীয় টীকার একটি পুঁথি লেখা হইয়াছিল হরিবর্মদেবের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে, এবং ৪৬ রাজ্যাঙ্কে অর্থাৎ সাত বৎসর পর, "পূর্বোত্তর দিশাভাগে বেংগনদ্যাস্তথা কূলে" গৌরী নামে একটি (বৌদ্ধ?) মহিলা স্বপ্নে আদিষ্ট হইযাছিলেন গ্রন্থটি নিয়মিত বাচনের জন্য।[১] এই বেংগ নদী, মনে হয়, যশোর কি ফরিদপুর জেলার কোনও নদী। এই অঞ্চলেই পঞ্চদশ শতকেও বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায় ১৪৯২ সংবতের (= ১৪৩৬) মহাযান মতের বিখ্যাত গ্রন্থ বোধিচর্যাবতারের একটি অনুলিপি হইতে।[২] পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের আমলে বৌদ্ধ রাজবংশের যে ঔদার্য ছিল সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের সে ঔদার্যের এতটুকু চিহ্ন কোথাও দেখা যাইতেছে না। কান্তিদেবের পিতা বৌদ্ধ ধনদত্ত একজন পরম শিবভক্ত রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং নিজের সুভাষিত-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে ব্যুৎপত্তির কথা বলিতে গিয়া গর্বানুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কান্তিদেব নিজে বৌদ্ধ হইয়াও তাঁহার রাজকীয় শীলমোহরে বৌদ্ধ পিতা ও শৈব মাতা উভয়ের ধর্মের সমন্বিত রূপ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই ধরণের বহু দৃষ্টান্ত আগেও উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শের সেই উদারতার যুগ আর ছিল না। সেন-

১ Sastri, H. P.—Cat. of Mss. Nepal.

২ এই অনুলিপিটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন সোহিথতরা গ্রামনিবাসী কুটুম্বিক উচ্চমহত্তম শ্রীমাধবমিত্রের পুত্র মহত্তম শ্রীরামদেবের স্বার্থ-পরার্থের জন্য "সদ্‌বৌদ্ধ করণ কায়স্থ ঠক্কুর" শ্রীঅমিতাভ। কোন্ এক সময়ে পুঁথিখানা গুণকীর্তি "ভিক্ষুপাদানাং" অধিকারে ছিল। Sastri, H. P.—Cat. of Mss. Nepal.

বর্মণদের আমলে এই ঔদার্যের এতটুকু দৃষ্টান্ত কোথাও নাই। দ্বিতীয়তঃ, সেন-বর্মণ-দেব রাষ্ট্র ও রাজবংশ বাংলার অতীত সামাজিক বিবর্তনের ধারা, বিশেষভাবে, গৌরবময় পাল-চন্দ্র যুগের ধারা, গতি প্রকৃতি ও আদর্শ একেবারে অস্বীকার করিয়া বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ বাংলাদেশে পুনঃপ্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-কালিদাস-ভবভূতি যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের কথা বলিয়াছেন সেই ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সমাজ-জীবনে সঞ্চার করিবার প্রয়াস লিপিগুলিতে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে সুস্পষ্ট।[১] কনক-তুলাপুরুষ মহাদান, ঐন্দ্রীমহাশান্তি, হেমাশ্বমহাদান, হেমাশ্বরথদান প্রভৃতি যাগযজ্ঞ; সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থান দ্বাদশীতিথি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি প্রভৃতি উপলক্ষে স্নান, তর্পণ, পূজানুষ্ঠান; শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফলাকাঙ্ক্ষা; বিভিন্ন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ; গোত্র, প্রবর, গাঞী প্রভৃতির বিশদ্ বিস্তৃত

১ এই যুগের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রতিনিধি হলায়ুধ সন্দেহ নাই। তাঁহার "ব্রাহ্মণ সর্বস্বের" গোড়াতেই আত্মপ্রশস্তিমূলক কয়েকটি শ্লোক আছে, তাহার একটি এই :—

পাত্রং দারুময়ং কচিদ্ বিজয়তে কচিৎ ভাজনং
কুত্রাপ্যস্তি দুকূলমিন্দুধবলং কুত্রাপি কৃষ্ণাজিনম্।
ধূপঃ কাপি বষট্‌কৃতাহুতিকৃতো ধূমঃ পরঃ কাপ্যভূদ্
অগ্নে কর্মফলং চ তস্য যুগপজ্জাগর্তি যন্মন্দিরে।

[হলায়ুধের নিজের গৃহে] কোথায়ও কাঠের [যজ্ঞ] পাত্র [ছড়াইয়া আছে]; কোথাও বা স্বর্ণপাত্র [ইত্যাদি]। কোথাও ইন্দুধবল দুকুলবস্ত্র; কোথাও কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম। কোথাও ধূপের [গন্ধময় ধূম]; কোথাও বষট্‌কার ধ্বনিময় আহুতির ধূম। [এইভাবে তাঁহার গৃহে] অগ্নির এবং [তাঁহার নিজের] কর্মফল যুগপৎ জাগ্রত।

ইহাই ব্রাহ্মণ্য সেন-রাষ্ট্রের ভাবপরিমণ্ডল। হলায়ুধ-গৃহের ভাবকল্পনাই সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভাবকল্পনা।

পরিচয়োল্লেখ ; দূর্বাতৃণ জলসিক্ত করিয়া দানকার্য সমাপন ; নীতিপাঠক শান্ত্যাগারিক, প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের উপর রাষ্ট্রের কৃপাবর্ষণ ইত্যাদির সামাজিক ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট—সে ইঙ্গিত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রচলন এবং পাল-চন্দ্র যুগের সমন্বয় ও সমীকরণাদর্শের বিলোপ। বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ধর্মাদর্শের সহজ স্বাভাবিক বিবর্তিত সমন্বয় নয়, ঔদার্যময় বিন্যাস নয়, এক বর্ণ, এক ধর্ম ও সমাজাদর্শের একাধিপত্যই সেন-বর্মণ যুগের একতম কামনা ও আদর্শ। সে বর্ণ ব্রাহ্মণ বর্ণ। সে ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। এবং সে সমাজাদর্শ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ। এই কালের স্মৃতি-ব্যবহার-মীমাংসা গ্রন্থে আগেই দেখিয়াছি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের জয়জয়কার ; লিপিমালায়ও তাহাই দেখিলাম। সেই আদর্শই হইল সমাজ-ব্যবস্থার মাপকাঠি। রাষ্ট্রের শীর্ষে যাঁহারা আসীন সেই রাজারা, এবং রাষ্ট্রের যাঁহারা প্রধানতম সমর্থক সেই ব্রাহ্মণেরা দুইয়ে মিলিয়া এই আদর্শ ও মাপকাঠি গড়িয়া তুলিলেন—পরস্পরের সহযোগীতায়, পোষকতায় ও সমর্থনে, এবং মূর্তিতে, মন্দিরে, রাজকীয় লিপিমালায়, স্মৃতি, ব্যবহার ও ধর্মশাস্ত্রে, সর্বথা সর্ব উপায়ে এই আদর্শ ও মাপকাঠি সবলে সোৎসাহে প্রচার করিলেন। পশ্চাতে যেখানে রাষ্ট্রের সমর্থন সেখানে এই প্রচার কার্য ও ঈপ্সিত সমাজ-ব্যবস্থার দ্রুত প্রচলন সার্থক হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

পরিণতি

ভিন্-প্রদেশী বর্মণ ও সেনাধিপত্য সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই (তখন পাল পর্বের শেষ অধ্যায়) বাংলার ইতিহাস-চক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত হইয়া গেল। বৈদিক, আর্য ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি বাংলাদেশে গুপ্ত আমল হইতেই সবেগে প্রবাহিত হইতেছিল,

সে-প্রমাণ আমরা আগেই পাইয়াছি। তিনশত সাড়েতিনশত বৎসর ধরিয়া এই প্রবাহ চলিয়াছে। বৌদ্ধ খড়্গ-পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের কালেও তাহা ব্যাহত হয় নাই; বরং আমরা দেখিয়াছি সামাজিক আদর্শ ও অনুশাসনের ক্ষেত্রে এইসব রাষ্ট্র ও রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য আদর্শ ও অনুশাসনকেই মানিয়া চলিত, কারণ সেই আদর্শ ও অনুশাসনই ছিল বৃহত্তর জনসাধারণের, অন্ততঃ উচ্চতর স্তর সমূহের লোকদের আদর্শ ও অনুশাসন। কিন্তু, বৌদ্ধ বলিয়াই হউক বা অন্য সামাজিক বা অর্থনৈতিক কারণেই হউক, পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ ও অনুশাসনের একটা ওদার্য ছিল—তাহার দৃষ্টান্ত সত্য সত্যই অফুরন্ত—ব্রাহ্মণ্য সামাজিক আদর্শকেই একটা বৃহত্তর সমন্বিত ও সমীকৃত আদর্শের রূপ দিবার সজাগ চেষ্টা ছিল; অন্যতর সামাজিক যুক্তিপদ্ধতি ও আদর্শকে অস্বীকার করার কোনও চেষ্টা ছিল না, কোনও সংরক্ষণী মনোবৃত্তি সক্রিয় ছিল না। সেন-বর্মণ আমলে কিন্তু তাহাই হইল; সমাজ ব্যবস্থায় কোনও ঔদার্য, অন্যতর আদর্শ ও ব্যবস্থার কোনও স্বীকৃতিই আর রহিল না; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি এবং তদনুযায়ী সমাজ ও বর্ণ ব্যবস্থা একান্ত হইয়া উঠিল; তাহারই সর্বময় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল—রাষ্ট্রের ইচ্ছায় ও নির্দেশে।

ফল যাহা ফলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ফলিল। বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে তাহার পরিপূর্ণ রূপ দেখিতেছি সমসাময়িক স্মৃতি গ্রন্থাদিতে, বৃহদ্ধর্ম পুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, সমসাময়িক লিপিমালায় এবং কিছু কিছু পরবর্তী কুলজী গ্রন্থমালায়।

ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক বর্ণব্যবস্থার চূড়ায় থাকিবেন স্বয়ং ব্রাহ্মণেরা ইহা ত খুবই স্বাভাবিক। নানা গোত্র, প্রবর ও বিভিন্ন বৈদিক শাখানুষ্ঠায়ী

ব্রাহ্মণেরা যে পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই উত্তর ভারত হইতে বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা তো আমরা আগেই দেখিয়াছি। "মধ্যদেশ-বিনির্গত" ব্রাহ্মণদের সংখ্যা অষ্টম শতক হইতে ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতে আরম্ভ করিল; ক্রোড়ঞ্চি-ক্রোড়ঞ্জ (=কোলাঞ্চ), তর্কারি (যুক্তপ্রদেশের শ্রাবস্তী অন্তর্গত), মৎস্যাবাস কুন্তীর, চন্দবার (এটোয়া জেলার বর্তমান চান্দোয়ার), হস্তিপদ, মুক্তাবাস্ত এমন কি সুদূর লাট (গুজরাত) দেশ হইতে ব্রাহ্মণ পরিবার-দের বাংলাদেশে আসিয়া বসবাসের দৃষ্টান্ত এ যুগের লিপিগুলিতে সমানেই পাওয়া যাইতেছে।[১] ইঁহারা এদেশে আসিয়া পূর্বাগত ব্রাহ্মণদের এবং তাঁহাদের অগণিত বংশধরদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমানই স্বাভাবিক।

গাঞী বিভাগ

কুলজীগ্রন্থের আদিশূর-কাহিনীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বর্ণকাহিনী রচনার প্রয়োজন নাই; লিপিমালা ও সমসাময়িক স্মৃতি-গ্রন্থাদির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই দেখিতেছি ভট্ট, চট্ট, বন্দ্য ইত্যাদি গ্রামের নামে পরিচয় দিবার একটি রীতি ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যাইতেছে; নিঃসংশয়ে বলিবার উপায় নাই, কিন্তু মনে হয় গাঞী পরিচয় রীতির তখন হইতেই প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তখনও বিধিবদ্ধ, প্রথাবদ্ধ হয় নাই। দ্বাদশ ত্রয়োদশ

---

১ Ep. Ind. XIII 292 p.; Insc of Bengal, 24, 67, 157, pp; গৌড়-লেখমালা, ২৬-২৭, ৯৭ পৃ; Ep. Ind. XXII, 150 p; XV, 293 p, ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকা, ১৩৪৪, ১ম খণ্ড, ২৬৪ পৃ।

শতকে কিন্তু এই রীতি একেবারে সুনির্দিষ্ট সীমায় প্রথাবদ্ধ নিয়মবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ভবদেব ভট্টের মাতা বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ কন্যা; "টীকাসর্বস্ব" গ্রন্থের রচয়িতা আর্তিহরপুত্র সর্বানন্দ (১১৫৯-৬০) বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ[১] ভবদেব স্বয়ং এবং শান্ত্যাগরাধিকৃত ব্রাহ্মণ রামদেব-শর্মা উভয়েই সাবর্ণগোত্রীয় এবং সিদ্ধল গ্রামীয়;[২] বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ-ভট্ট চম্পাহিটী বা চম্পহট্টীয় মহামহোপাধ্যায়,[৩] মদনপালের মনহলি লিপির দানগ্রহীতা বটেশ্বরও চম্পহট্টীয়;[৪] জীমূতবাহন আত্মপরিচয় দিয়াছেন পারিভদ্রীয় বলিয়া।[৫] দশরথদেবের আদাবাড়ী লিপিতে দিণ্ডী, পালি বা পালী, সেউ, মাসচটক বা মাসচড়ক, মূল, সেহন্দায়ী, পুতি, মহান্তিয়াড়া এবং করঞ্জ প্রভৃতি গাঞী পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। হলায়ূধের মাতৃপরিচয় গোচ্ছাষণ্ডী গ্রামীয়রূপে,[৬] লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি শ্রীনিবাসের মহিন্তাপনীবংশ পরিচয়ও গাঞী পরিচয়।[৭] বরেন্দ্রীর তটক, মৎস্যাবাস; রাঢ়ার ভূরিশ্রেষ্ঠী, পূর্বগ্রাম, তালবাটী, কাঞ্জিবিল্লী এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক গ্রামের (যথা, ভট্টশালী, শকটী, রত্নামালী, তৈলপাটী, হিজ্জলবন, চতুর্থখণ্ড, বাপডলা) ব্রাহ্মণদের উল্লেখ সমসাময়িক লিপি ও গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাইতেছে।[৮] সংকলয়িতা

---

১ Insc. of Bengal, III, p. 37; টীকাসর্বস্ব, Ed. Trivandrum, Sans. Ser. 4. Vols; also see JRAS., 1927, p. 472.

২ Insc. of Bengal, III, p. 36 and 24 respectively.

৩ JASB., 1912, 343 p.

৪ গৌড়লেখমালা, ১৫৪ পৃ।

৫ কালবিবেক গ্রন্থের পুষ্পিকা; কালবিবেক, Bib. Ind. Intro. viii p.

৬ ব্রাহ্মণসর্বস্ব; Ind. Culture, I, 505 p.

৭ অদ্ভুতসাগর; Ind. Ant., 1922, 47 p.

৮ সদুক্তিকর্ণামৃত, Ed. by Ramavatara Sarma & Haradatta Sarma, Intro 44, 47, 58, 71, 81

শ্রীধর দাসের "সদুক্তিকর্ণামৃত" (১২০৬) গ্রন্থেও দেখিতেছি বাঙালী ব্রাহ্মণদের নামের সঙ্গে—বর্তমান ক্ষেত্রে নামের পূর্বে—গ্রামের নাম অর্থাৎ গাঞী পরিচয় ব্যবহারের রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, যথা, ভট্টশালীয় পীতাম্বর, তৈলপাটীয় গাঙ্গোক, কেশরকোলীয় নাথোক, বন্দিঘটীয় সর্বানন্দ, ইত্যাদি।[১] এইসব গাঞী পরিচয় অল্পবিস্তর পরিবর্তিতরূপে কুলজীগ্রন্থমালার রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পঞ্চগোত্রে বিভক্ত ১৫৬টী গাঞী পরিচয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। কালক্রমে এই গাঞী পরিচয়প্রথা বিস্তৃত হইয়াছে, বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমিত হইয়াছে ; এই সীমিত, বিধিবদ্ধ প্রথারই অস্পষ্ট পরিচয় আমরা পাইতেছি কুলজীগ্রন্থমায়।

ভৌগোলিক বিভাগ

কিন্তু গাঞী বিভাগ অপেক্ষাও সামাজিক দিক হইতে গভীর অর্থবহ বিভাগ ব্রাহ্মণদের ভৌগোলিক বিভাগ। এক্ষেত্রেও কুলজীগ্রন্থের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া লাভ নাই; কারণ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ও অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের উদ্ভব সম্বন্ধে এইসব গ্রন্থে যে বিবরণ পাওয়া যাইতেছে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু হলায়ুধের "ব্রাহ্মণসর্বস্ব" প্রামাণ্যগ্রন্থ, এবং তাহার রচনাকালও সুনির্দিষ্ট। এই গ্রন্থে হলায়ুধ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা যথার্থ বেদবিদ্ ছিলেন না; ব্রাহ্মণদের বেদচর্চার সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল, তাঁহার মতে, উৎকল ও পাশ্চাত্যদেশ সমূহে[২]। যাহাই হউক, হলায়ুধের সাক্ষ্য হইতে

---

১ Ed. Ind. XV. 301 p , ন্যায়কন্দলী ; Jour Andhra Hist. Sec IV, 158-62 ; Ind. Off Cat. I, Part one, No. 450 ; D.U Mss, no. 4092.

২ ব্রাহ্মণসর্বস্ব, বারাণসী সং, সংবৎ ১৯৩৫ ; তেজেশচন্দ্র বিদ্যানন্দ সম্পাদিত কলিকা৷ ১ সং, বাং ১৩৩১।

দেখিতেছি, দ্বাদশ শতকেই জনপদ বিভাগানুযায়ী ব্রাহ্মণদের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে; এবং লিপিসাক্ষ্য হইতে জানা যায়, এই সব ব্রাহ্মণেরা রাঢ় ও বরেন্দ্রীর বাহিরে পূর্ব বঙ্গেও বসতি স্থাপন করিতেছেন। বরেন্দ্রীর তটকগ্রামীয় একজন ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, অন্ততঃ একটি দৃষ্টান্ত আমরা জানি [১]। কুলজী গ্রন্থমালায় দেখা যায় কায়স্থ, বৈদ্য, বারুই প্রভৃতি অব্রাহ্মণ উপবর্ণদের ভিতরও রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং বঙ্গজ প্রভৃতি ভৌগোলিক বিভাগ প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এসম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নাই।

বৈদিক ব্রাহ্মণ

রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র বিভাগ ছাড়া ব্রাহ্মণদের আর একটি শ্রেণী—বৈদিক—বোধ হয় এই যুগেই উদ্ভূত হইয়াছিল। কুলজী গ্রন্থমালায় এসম্বন্ধে দুইটি কাহিনী আছে; একটি কাহিনী মতে, বাংলাদেশে যথার্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না থাকায় এবং যজ্ঞাগ্নি যথানিয়মে রক্ষিত না হওয়ায় রাজা শ্যামলবর্ম্মণ (বোধ হয় বর্ম্মণরাজ সামল বর্ম্মণ) কান্যকুব্জ (কোনও কোনও গ্রন্থমতে, বারাণসী) হইতে ১০০১ শকাব্দে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। অপর কাহিনী মতে সরস্বতী নদীতীরস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণেরা যবনাক্রমণের ভয়ে ভীত হইয়া বাংলাদেশে পলাইয়া আসেন, এবং বর্ম্মণরাজ হরিবর্ম্মণের পোষকতায় ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায় বসবাস আরম্ভ করেন। উত্তর ভারত হইতে আগত এইসব বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই পাশ্চাত্য বৈদিক নামে খ্যাত। বৈদিক ব্রাহ্মণদের আর এক শাখা আসেন উৎকল ও দ্রাবিড় হইতে; ইঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে খ্যাত। এই কুলজী কাহিনীর মূল বোধ হয় হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বগ্রন্থে

১ Ep. Ind. XVII, 356 P.

পাওয়া যাইতেছে। এই গ্রন্থ-রচনার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া হলায়ুধ বলিতেছেন, রাঢীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করিত না এবং সেই হেতু বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের রীতিপদ্ধতিও জানিত না ; যথার্থ বেদজ্ঞান তাঁহার সময়ে উৎকল ও পাশ্চাত্যদেশেই প্রচলিত ছিল। বাংলার ব্রাহ্মণেরা নিজেদের বেদজ্ঞ বলিয়া দাবি করিলেও যথার্থত বেদচর্চার প্রচলন বোধ হয় সত্যই তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। হলায়ুধের আগে বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ ভট্টও তাঁহার "পিতৃদয়িতা" গ্রন্থে বাংলাদেশে বেদ চর্চার অবহেলা দেখিয়া দুঃখ করিয়াছেন।[১] যাহা হউক, পাশ্চাত্য বলিতে হলায়ুধ এক্ষেত্রে উত্তর ভারতকেই বুঝাইতেছেন, সন্দেহ নাই। বাংলা-দেশে উৎকল ও পাশ্চাত্যদেশাগত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বসবাস তখন করিতে-ছিলেন কি না এ সম্বন্ধে হলায়ুধ কোনও কথা বলেন নাই ; তবু, সামল-বর্মণ ও হরিবর্মণের সঙ্গে কুলজী কাহিনীর সম্বন্ধ, তাঁহাদের মোটামুটি তারিখ, অনিরুদ্ধ ভট্ট এবং হলায়ুধ কথিত রাঢ়ে-বরেন্দ্রীতে বেদচর্চার অভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎকল ও পশ্চিম দেশসমূহে বেদজ্ঞানের প্রসার, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য এই দুই শাখায় বৈদিক ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিভাগ, এইসব দেখিয়া মনে হয় সেন-বর্মণ আমলেই বাংলায় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের উদ্ভব দেখা দিয়াছিল।

এই সব শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছাড়া আরও দুই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের সংবাদ এই যুগেই পাওয়া যাইতেছে। গয়াজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিপিতে (১০৫৯ শক = ১১৩৭) দেখিতেছি, শাকদ্বীপাগত মগব্রাহ্মণ-পরিবার সম্ভূত জনৈক ব্রাহ্মণ গঙ্গাধর জয়পাণি নাম গৌড়রাষ্ট্রের একজন কর্মচারীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।[২] এই লিপি এবং বৃহদ্ধম-

১ পিতৃদয়িতা, ৮ পৃ।

২ Ep. Ind. II, 330 p.

পুরাণগ্রন্থের সাক্ষ্য হইতে দেবল বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের পরিচয় জানা যায়। শেষোক্ত গ্রন্থে স্পষ্টই বলা হইতেছে, দেবল ব্রাহ্মণেরা শাকদ্বীপ হইতে আসিয়াছিলেন, এবং সেই হেতু তাঁহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বল্লালসেনের "দানসাগর" গ্রন্থে সারস্বত নামে আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের খবর পাওয়া যাইতেছে। কুলজীগ্রন্থের মতে ইঁহারা আসিয়াছিলেন সরস্বতীনদীর তীর হইতে অন্ধ্রবাজ শূদ্রকের আহ্বানে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের উদ্ভব সম্বন্ধে কুলজীগ্রন্থে কিন্তু অন্য কাহিনী দেখা যাইতেছে; এই কাহিনী মতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের পূর্ব পুরুষরা গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত ছিলেন, এবং ইঁহারা বাংলাদেশে প্রথম আসিয়াছিলেন গৌড়রাজ শশাঙ্কের আমলে, শশাঙ্কেরই আহ্বানে —তাঁহাব রোগমুক্তি উদ্দেশে গ্রহযজ্ঞ করিবার জন্য। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখিতেছি দেবল অর্থাৎ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পিতা এবং বৈশ্যমাতার সন্তানরা গ্রহবিপ্র বা গণক নামে পরিচিত হইতেছেন। যাহাই হউক ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ গ্রন্থে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে গণক বা গ্রহবিপ্ররা (এবং সম্ভবতঃ, দেবল-শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণরাও) ব্রাহ্মণ সমাজে সম্মানিত ছিলেন না; গণক-গ্রহবিপ্ররা তো 'পতিত' বলিয়াই গণ্য হইতেন, এবং সেই পাতিত্যেব কারণ বৈদিক ধর্মে তাঁহাদের অবজ্ঞা, জ্যোতিষ ও নক্ষত্রবিদ্যায় অতিরিক্ত আসক্তি এবং জ্যোতির্গণনা করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ। এই গণক বা গ্রহবিপ্রদেরই একটি শাখা অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, ইঁহারাও 'পতিত' বলিয়া গণ্য হইতেন, কারণ তাঁহারাই সর্বপ্রথম শূদ্রদের নিকট হইতে এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেই ভট্ট ব্রাহ্মণ নামে আর এক নিম্ন বা পতিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণের খবর পাওয়া যাইতেছে; সূত পিতা এবং বৈশ্য মাতার সন্তানরাই ভট্ট ব্রাহ্মণ, এবং অন্যলোকের যশোগান করাই ইঁহাদের উপজীবিকা,

এ-সংবাদও এই গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। ইঁহারা নিঃসন্দেহে বর্তমান কালের ভাট ব্রাহ্মণ। এখানেও 'পতিত' ব্রাহ্মণদের তালিকা শেষ হইতেছে না। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে দেখিতেছি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা উত্তম সঙ্কর পর্যায়ের ২০ বিশটি উপবর্ণ ছাড়া (ইঁহারা সকলেই শূদ্র) আর কাহাদেরও পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিতে পারিতেন না; মধ্যম ও অধম সঙ্কর বা অন্ত্যজ পর্যায়ের কাহারও পৌরোহিত্য করিলে তিনি 'পতিত' হইয়া যজমানের বর্ণ বা উপবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। মধ্যযুগের ও বর্তমান কালের 'বর্ণ ব্রাহ্মণ'দের উৎপত্তি এইভাবেই হইয়াছে। স্মার্ত ভবদেব ভট্ট বলিতেছেন, এই সব ব্রাহ্মণদের স্পৃষ্ট খাদ্য যথার্থ ব্রাহ্মণদের খাওয়া নিষেধ, খাইলে যে অপরাধ হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কৃচ্ছ্রসাধনের বিধানও তিনি দিয়াছেন। এই বিধিনিষেধ ক্রমশঃ কঠোরতর হইয়া মধ্যযুগেই দেখা গেল, পতিত বর্ণব্রাহ্মণ ও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান দূরে থাক্ তাঁহাদের স্পৃষ্ট জলও যথার্থ ব্রাহ্মণেরা পান করিতেন না। তাহা ছাড়া কতকগুলি বৃত্তি ছিল ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ ; ভবদেব ভট্ট তাহার এক সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। ব্রাহ্মণদের তো প্রধান বৃত্তিই ছিল ধর্মকর্মানুষ্ঠান এবং অন্যের ধর্মানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা। অধিকাংশ ব্রাহ্মণই তাহা করিতেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক রাজা ও রাষ্ট্র, ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের কৃপা লাভ করিয়া দান ও দক্ষিণাস্বরূপ প্রচুর অর্থ ও ভূমির অধিকারী হইতেন, এমন প্রমাণেরও অভাব নাই। আবার অনেক ব্রাহ্মণ ছোটবড় রাজকর্মও করিতেন ; ব্রাহ্মণ রাজবংশের খবরও পাওয়া যায়। পাল আমলে দর্ভপাণি কেদারমিশ্রের বংশ, বৈদ্যদেবের বংশ, বর্মণরাষ্ট্রে ভবদেবভট্টের বংশ, সেনরাষ্ট্রে হলায়ুধের বংশ একদিকে যেমন উচ্চতম রাজপদ অধিকার করিতেন, তেমনই আর একদিকে শাস্ত্র

জ্ঞানে, বৈদিক যাগযজ্ঞ আচারানুষ্ঠানে, পাণ্ডিত্যে ও বিত্তাবত্তায় সমাজেও তাঁহাদের স্থান ছিল খুব সম্মানিত। ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধে নায়কত্ব করিতেন, যোদ্ধ্‌ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেন এমন প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু পূর্বোক্ত ভবদেবের তালিকায় দেখিতেছি, অনেক নিষিদ্ধবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের পক্ষে শূদ্রবর্ণের অধ্যাপনার, তাঁহাদের পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য, চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিত্মার চর্চা, চিত্র ও অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পবিত্মার চর্চা প্রভৃতি বৃত্তিও নিষিদ্ধ ছিল; করিলে পতিত হইতে হইত। অথচ কৃষিবৃত্তি নিষিদ্ধ ছিল না; যুদ্ধবৃত্তিতে আপত্তি ছিল না; মন্ত্রী, সন্ধি-বিগ্রহিক, ধর্মাধ্যক্ষ বা সেনাধ্যক্ষ হইলে কেহ পতিত হইত না! অথচ বর্ণবিশেষের অধ্যাপনা বা পৌরোহিত্য নিষিদ্ধ ছিল!

ব্রাহ্মণেতর বর্ণবিভাগ

বৃহদ্ধর্মপুরাণে[১] দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলাদেশে আর যত বর্ণ আছে, সমস্তই সঙ্কর; চতুর্বর্ণের যথেচ্ছ পারস্পরিক যৌনমিলনে উৎপন্ন মিশ্রবর্ণ, এবং তাঁহারা সকলই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণদ্বয়ের উল্লেখই এই গ্রন্থে নাই। ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত শূদ্র সঙ্কর উপবর্ণগুলিকে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি উপবর্ণের স্থান ও

১ Bib. Ind. edn. এই গ্রন্থ দুইখণ্ডে বিভক্ত। এই অধ্যায়ে আহৃত সংবাদ গ্রন্থের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, সর্বত্র সূচী-নির্দেশ করিয়া লাভ নাই, সেইজন্য পাদটীকা সর্বত্র দেওয়া হয় নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে গ্রন্থখানির আনুপূর্বিক পাঠ প্রয়োজন। বর্ণবিন্যাস সংক্রান্ত অধিকাংশ তথ্য দ্বিতীয় অর্থাৎ উত্তরখণ্ডের ১৩শ ও ১৪শ অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। এই সঙ্গে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সুলিখিত আলোচনা দ্রষ্টব্য: ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকা, ১৩৩৬-৩৭, ২য় খণ্ড, ৮৭৩পৃ; ১৩৩৭-৩৮, ১ম খণ্ড, ৯৪ পৃ। বঙ্গবাসী প্রেস সম্পাদিত ও প্রকাশিত এই পুরাণের একটি সংস্করণ আছে, তবে Bib. Ind. সং অধিকতর প্রামাণিক।

বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই বর্ণ ও বৃত্তি বিবরণ দিতে গিয়া বৃহদ্ধর্মপুরাণ বেণ রাজা সম্বন্ধে যে গল্পের অবতারণা করিয়াছেন, কিংবা উত্তম, মধ্যম ও অধম সঙ্কর এই তিন পর্যায় বিভাগের যে-ব্যাখা দিয়াছেন, তাহার উল্লেখ বা আলোচনা অবান্তর। কারণ, স্মৃতিগ্রন্থের বর্ণ উপবর্ণ ব্যাখ্যার সঙ্গেও বাস্তব ইতিহাসের যোগ আবিষ্কার করা কঠিন। যাহা হউক, এই গ্রন্থ তিন পর্যায়ে ৩৬টি উপবর্ণ বা জাতের কথা বলিতেছে, যদিও তালিকাভুক্ত করিতেছে ৪১ টি জাত। বাংলাদেশের জাত-সংখ্যা বলিতে আজও আমরা বলি ছত্রিশ জাত। ৩৬টিই বোধ হয় ছিল আদি সংখ্যা, পরে আরও ৫টি উপবর্ণ এই তালিকায় ঢুকিয়া পড়িয়া থাকিবে। উত্তম-সংকর পর্যায়ে ২০টি উপবর্ণ:

উত্তম-সংকর

১। করণ—ইহারা লেখক ও পুস্তকর্মদক্ষ, এবং সংশূদ্র বলিয়া পরিগণিত।

২। অম্বষ্ঠ—ইহাদের বৃত্তি চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদচর্চা, সেই জন্য ইহারা বৈদ্য বলিয়া পরিচিত। ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয় বলিয়া ইহাদের বৃত্তি বৈশ্যের, কিন্তু ধর্মকর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে ইহারা শূদ্র বলিয়াই গণিত।

৩। উগ্র—ইহাদের বৃত্তি ক্ষত্রিয়ের, যুদ্ধবিদ্যাই ইহাদের ধর্ম।

৪। মাগধ—হিংসামূলক যুদ্ধব্যবসায়ে অনিচ্ছুক হওয়ায় ইহাদের বৃত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছিল সূত বা চারণের এবং সংবাদবাহীর।

৫। তন্ত্রবায় (তাঁতী)।

৬। গান্ধিক বণিক (গন্ধদ্রব্য বিক্রয় যে বণিকের বৃত্তি; বর্তমানের গন্ধবণিক)।

৭। নাপিত।

৮। গোপ—লেখক।

৯। কর্মকার (কামার)।

১০। তৈলিক বা তৌলিক—গুবাক-ব্যবসায়ী।

১১। কুম্ভকার (কুমোর)।

১২। কংসকার (কাঁসারী)।

১৩। শাংখিক বা শংখকার (শাঁখারী)।

১৪। দাস—কৃষিকার্য ইহাদের বৃত্তি, অর্থাৎ চাষী।

১৫। বারজীবি (বারুই)—পানের বরজ উৎপাদন করা ইহাদের বৃত্তি।

১৬। মোদক (ময়রা)।

১৭। মালাকাব।

১৮। সুত—বৃত্তি উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু অনুমান হয় ইহারা চারণ গায়ক—'পতিত' ব্রাহ্মণ।

১৯। রাজপুত্র—বৃত্তি অনুল্লিখিত (রাজপুত ?)।

২০। তাম্বলী (তামলী)—পানবিক্রেতা।

মধ্যম সংকর

মধ্যম সংকরপর্যায়ে ১২টি উপবর্ণ :

২১। তক্ষণ—খোদাইকর।

২২। রজক।

২৩। স্বর্ণকার—সোনার অলঙ্কার ইত্যাদি প্রস্তুত কারক।

২৪। সুবর্ণবণিক—সোনাব্যবসায়ী।

২৫। আভীর (আহীর)—গোয়ালা, গরুরক্ষক।

২৬। তৈলকার (তেলী)।

২৭। ধীবর—মৎস্যব্যবসায়ী।

২৮। শৌণ্ডিক (শুঁড়ি)।

২৯। নট—যাহারা নাচে, খেলা ও বাজি দেখায়।

৩০। শাবাক, শাবক, শারক, শাবার (?)।

৩১। শেখর (?)।

৩২। জালিক (জেলে, জালিয়া)

অধম সংকর বা অন্ত্যজ

অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ে ৯টি উপবর্ণ; ইহারা সকলেই বর্ণাশ্রম বহিষ্কৃত; অর্থাৎ ইহারা অস্পৃশ্য, এবং ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমব্যবস্থার মধ্যে ইঁহাদের কাহারও কোনও স্থান নাই।

৩৩। মলেগ্রহী (বঙ্গবাসী সং : মলেগৃহি)।

৩৪। কুডব (?)।

৩৫। চণ্ডাল (চাঁড়াল)।

৩৬। বরুড় (বাউড়ী ?)

৩৭। তক্ষ (তক্ষণ ?)।

৩৮। চর্মকার (চামার)।

৩৯। ঘট্টজীবি (পাঠান্তরে ঘণ্টজীবি—খেয়াঘাটের রক্ষক, খেয়া-পারাপার মাঝি ? বর্তমান, পাটনী ?)।

৪০। ডোলাবাহী—ডুলি বেহারা, বর্তমান ডুলিয়া, দুলে (?)।

৪১। মল্ল (বর্তমান মালো ?)।

ম্লেচ্ছ

এই ৪১টি জাত ছাড়া ম্লেচ্ছ পর্যায়ে আরও কয়েকটি দেশী ও ভিন্-প্রদেশী কোমের নাম পাওয়া যায়; স্থানীয় বর্ণব্যবস্থার মধ্যে ইঁহাদেরও

কোনও স্থান ছিল না, যথা, পুক্কশ, পুলিন্দ, খস, খর, কম্বোজ, যবন, সুহ্ম, শবর ইত্যাদি।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও অনুরূপ বর্ণবিন্যাসের খবর পাওয়া যাইতেছে।[১] 'সৎ' ও 'অসৎ' (উচ্চ ও নিম্ন) এই দুই পর্যায়ে শূদ্রবর্ণের বিভাগের আভাস বৃহদ্ধর্মপুরাণেই পাওয়া গিয়াছে; করণদের বলা হইয়াছে 'সৎশূদ্র'। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সমস্ত সঙ্কর বা মিশ্র উপবর্ণগুলিকে সৎ ও অসৎ শূদ্র এই দুই পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। সৎশূদ্র পর্যায়ে যাহাদের গণ্য করা হইয়াছে তাহাদের এইভাবে তালিকাগত করা যাইতে পারে:

সৎশূদ্র

১। করণ।

২। অম্বষ্ঠ (দ্বিজ পিতা এবং বৈশ্যমাতার সন্তান)।

৩। বৈদ্য (জনৈক ব্রাহ্মণীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে জাত সন্তান: চিকিৎসাবৃত্তি)[২]।

১ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কৃত সংস্করণ। এই ক্ষেত্রেও সর্বত্র পৃথক সূচীনির্দেশ দেওয়া হইতেছেনা। এই অধ্যায়ে আহৃত অধিকাংশ সংবাদ এই গ্রন্থের প্রথম অর্থাৎ ব্রহ্মখণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে পাওয়া যাইবে; ১৬-২১ এবং ৯০—১৩৭ শ্লোক বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। ২।৪টি তথ্য অন্যত্র বিক্ষিপ্তও যে নাই তাহা নয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মিশ্র-বর্ণেরও সম্পূর্ণ তালিকা এক্ষেত্রে উদ্ধার করা হয় নাই, করিয়া লাভও নাই; কারণ, এই পুরাণই বলিতেছে, 'মিশ্রবর্ণ অসংখ্য, কে তাহার সমস্ত নাম উল্লেখ ও গণনা করিতে পারে' (১।১০।১২২)? সৎশূদ্রদের তালিকাও যে সম্পূর্ণ নয় তাহার আভাসও এই গ্রন্থেই আছে (১।১০।১৮)।

২ লক্ষ্যণীয় যে এই পুরাণ বৈদ্য ও অম্বষ্ঠদের পৃথক উপবর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে; এবং উভয় উপবর্ণের যে উৎপত্তি-কাহিনী দিতেছে, তাহাও পৃথক।

৪। গোপ।

৫। নাপিত।

৬। ভিল্ল—(ইহারা আদিবাসি কোম ; কি করিয়া সৎশূদ্র পর্যায়ে পরিগণিত হইলেন বলা কঠিন)।

৭। মোদক।

৮। কূবর—?

৯। তাম্বূলী

১০। স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিক } ইহারা পরে ব্রাহ্মণের অভিশাপে 'পতিত' হইয়া 'অসৎ শূদ্র' পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছিল ; স্বর্ণকারদের অপরাধ, সোনাচুরি।

১১। মালাকার।

১২। কর্মকার।

১৩। শংখকার।

১৪। কুবিন্দক (তন্তুবায়)।

১৫। কুম্ভকার।

১৬। কংসকার।

১৭। সূত্রধার।

১৮। চিত্রকার।

১৯। স্বর্ণকার।

সূত্রধার ও চিত্রকার কর্তব্যপালনে অবহেলা করায় ব্রাহ্মণের অভিশাপে 'পতিত' হইয়া অসৎশূদ্রপর্যায়ে গণ্য হইয়াছিলেন। স্বর্ণকারও, পতিত' হইয়াছিলেন ; এ কথা আগেই বলা হইয়াছে।

পতিত বা অসৎশূদ্র পর্যায়ে যাঁহাদের গণনা করা হইত তাঁহাদের তালিকাগত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় ঃ

অসৎশূদ্র

স্বর্ণকার।

[সুবর্ণ] বণিক।

সূত্রধার (বৃহদ্ধর্মপুরাণের তক্ষণ।

চিত্রকার।

২০। অট্টালিকাকার।

২১। কোটক (ঘরবাড়ী তৈয়ার করা যাঁহাদের বৃত্তি)।

২২। তীবর (ধীবর ?)।

২৩। তৈলকার।

২৪। লেট (?)।

২৫। মল্ল।

২৬। চর্মকার।

২৭। শুঁড়ি।

২৮। পৌণ্ড্রক (পোদ ?)

২৯। মাংসচ্ছেদ (কসাই)।

৩০। রাজপুত্র।

৩১। কৈবর্ত (কলিযুগের ধীবর)

৩২। রজক।

৩৩। কৌয়ালী।

৩৪। গঙ্গাপুত্র।

৩৫। যুঙ্গি (যুগী ?)

৩৬। আগরী (বৃহদ্ধর্মপুরাণের উগ্র ? বর্তমানের আগুরী)।

অসৎশূদ্রেরও নিম্ন পর্যায়ে অর্থাৎ অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পযায়ে যাঁহাদের গণনা করা যায় তাঁহাদের তালিকাগত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় ঃ

ব্যাধ, ভড় (?), কোল (আদিবাসি কোম), কোঞ্চ (?), হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগ্‌দী ?), ব্যালগ্রাহী (বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের মলেগ্রহী ?) চণ্ডাল ইত্যাদি।

এই দুইটি বর্ণবিভাগের তালিকা তুলনা করিলে দেখা যায়

প্রথমোল্লিখিত গ্রন্থের উত্তম সংকর পর্যায় এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের সৎশূদ্র পর্যায় প্রায় এক এবং অভিন্ন; শুধু মাগধ, গন্ধবণিক, তৌলিক বা তৈলিক, দাস, বারজীবি, এবং সূত দ্বিতীয় গ্রন্থের তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে; পরিবর্তে পাইতেছি ভিল্ল ও কুবর এই দুইটি উপবর্ণের উল্লেখ, এবং বৈদ্যদের উল্লেখ (অম্বষ্ঠ হইতে) পৃথক উপবর্ণ হিসাবে। তাহা ছাড়া প্রথম গ্রন্থের উত্তম সংকর বর্ণের রাজপুত্র দ্বিতীয় গ্রন্থে অসৎশূদ্র পর্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থের মধ্যম সংকর পর্যায় এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের অসৎশূদ্র পর্যায় এক এবং অভিন্ন; শুধু বৃহদ্ধর্মপুরাণের আভীর, নট, শাবাক, শেখর ও জালিক দ্বিতীয় গ্রন্থের তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে; পরিবর্তে পাইতেছি অট্টালিকাকার, কোটক, লেট, মল্ল, চর্মকার, পৌণ্ড্রক, মাংসচ্ছেদ, কৈবর্ত, গঙ্গাপুত্র, যুঙ্গি, আগরী, এবং কোয়ালী। ইহাদের মধ্যে মল্ল ও চর্মকার বৃহদ্ধর্মপুরাণের অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ের। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ধীবর ও জালিক, মৎস্যব্যবসাগত এই দুইটি উপবর্ণের খবর পাইতেছি; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পাইতেছি তীবর ও কৈবর্ত। কৈবর্তদের উদ্ভব সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে: কৈবর্ত ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান, কিন্তু কলিযুগে তীবরদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ইহারা ধীবর নামে পরিচিত হয় এবং ধীবর বৃত্তি গ্রহণ করে। ভবদেব ভট্টের মতে কৈবর্তরা অন্ত্যজ পর্যায়ের। ভবদেবের অন্ত্যজ পর্যায়ের তালিকা উপরোক্ত দুই পুরাণের তালিকার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে: রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ এবং ভিল্ল। ভবদেবের মতে চণ্ডাল ও অন্ত্যজ সমার্থক। চণ্ডাল, পুক্কস, কাপালিক, নট, নর্তক, তক্ষণ (বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত মধ্যম সংকর পর্যায়ের তক্ষণ, না অধম সংকর পর্যায়ের তক্ষ?), চর্মকার, সুবর্ণকার, শৌণ্ডিক, রজক এবং কৈবর্ত

প্রভৃতি নিম্নতম উপবর্ণের এবং পতিত ব্রাহ্মণদের পৃষ্ট খাদ্য ব্রাহ্মণদের অভক্ষ্য বলিয়া ভবদেবভট্ট বিধান দিয়াছেন, এবং খাইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহাও বলিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিনটি সাক্ষ্যে অল্পবিস্তর বিভিন্নতা থাকিলেও বর্ণ-উপবর্ণের স্তর উপস্তর বিভাগ সম্বন্ধে ইহাদের তিনজনেরই সাক্ষ্য মোটামুটি একই প্রকার। এই চিত্রই সেন-বর্মণদের আমলের বাংলাদেশের বর্ণবিন্যাসের সম্পূর্ণ চিত্র।

করণ-কায়স্থ

প্রথমই দেখিতেছি করণ ও অম্বষ্ঠদের স্থান। করণরা কিন্তু কায়স্থ বলিয়া অভিহিত হইতেছেন না; এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বৈদ্যদের স্পষ্টতই অম্বষ্ঠ হইতে পৃথক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। করণদের সম্বন্ধে পাল পর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে, এবং করণ ও কায়স্থরা যে বর্ণহিসাবে এক এবং অভিন্ন তাহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই অভিন্নতা পাল-পর্বেই স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিল; বৃহদ্ধর্মপুরাণে বা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কেন যে সে-ইঙ্গিত নাই তাহা বলা কঠিন। হইতে পারে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে তখনও তাহা সম্পূর্ণ স্বীকৃত হইয়া উঠে নাই।

অম্বষ্ঠ-বৈদ্য

বৃহদ্ধর্মপুরাণে বর্ণহিসাবে বৈদ্যদেরও উল্লেখ নাই, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে; কিন্তু সেখানেও বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ দুই পৃথক উপবর্ণ, এবং উভয়ের উদ্ভব ব্যাখাও বিভিন্ন। এই গ্রন্থেব মতে দ্বিজ পিতা ও বৈশ্য মাতার সঙ্গমে অম্বষ্ঠদেব উদ্ভব; কিন্তু বৈদ্যদের উদ্ভব সূর্যতনয় অশ্বিনীকুমার এবং জনৈকা ব্রাহ্মণীর আকস্মিক সঙ্গমে। বৈদ্য ও অম্বষ্ঠরা যে এক এবং অভিন্ন এই দাবি সপ্তদশ শতকে ভরত মল্লিকের আগে কেহ

করিতেছেন না ; ইনিই সর্বপ্রথম নিজে বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছেন। তবে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের উল্লেখ হইতে বুঝা যায়, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বৈদ্যরা উপবর্ণ হিসাবে বিদ্যমান, এবং বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ ও সদ্যোক্ত পুরাণটির সাক্ষ্য একত্র করিলে ইহাও বুঝা যায় যে, অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য উভয়েই সাধারণতঃ একই বৃত্তি অনুসারী ছিলেন। বোধ হয়, এক এবং অভিন্ন এই চিকিৎসাবৃত্তিই পরবর্তীকালে এই দুই উপবর্ণকে এক এবং অভিন্ন উপবর্ণে বিবর্তিত করিয়াছিল, যেমন করিয়াছিল করণ এবং কায়স্থদের।

কৈবর্ত-মাহিষ্য

পালপর্বে কৈবর্ত-মাহিষ্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি, তখন পর্যন্ত কৈবর্তদের সঙ্গে মাহিষ্যদেব যোগাযোগের কোনও সাক্ষ্য উপস্থিত নাই এবং মাহিষ্য বলিয়া কৈবর্তদের পরিচয়ের কোনও দাবিও নাই, স্বীকৃতিও নাই। সেন-বর্মণ-দেব পর্বেও তেমন দাবি কেহ উপস্থিত করিতেছেন না—এই যুগের কোনও পুরাণ বা স্মৃতিগ্রন্থেও তেমন উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ, মাহিষ্য নামে কোনও উপবর্ণের নামই নাই। কৈবর্তদের উদ্ভবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের রচয়িতা বলিতেছেন, ক্ষত্রিয়পিতা ও বৈশ্যমাতার সঙ্গমে কৈবর্তদের উদ্ভব। লক্ষ্যণীয় এই যে, গৌতম ও যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাদের প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে মাহিষ্যদের উদ্ভব সম্বন্ধে ঠিক এই ব্যাখ্যাই দিতেছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের লেখক কৈবর্ত সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা কোথায় পাইলেন, বলা কঠিন ; কোনও প্রাচীনতর গ্রন্থেই কৈবর্ত সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা নাই, সমসাময়িক বৃহদ্ধর্মপুরাণ বা কোনো স্মৃতিগ্রন্থেও নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণও ব্যাখ্যা যদি বা দিতেছেন মাহিষ্য-

ব্যাখ্যা অনুযায়ী, কিন্তু কলিযুগে ইহাদের বৃত্তি নির্দেশ করিতেছেন ধীবরের, মাহিষ্যের নয়। সুতরাং মনে হয়, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্যাখ্যার মধ্যেই কোনও গোলমাল রহিয়া গিয়াছে। দ্বাদশ শতকে ভবদেব ভট্ট কৈবর্তদের স্থান নির্দেশ করিতেছেন অন্ত্যজ পর্যায়ে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ধীবর ও মৎস্যব্যবসায়ী অন্য একটি জাতের অর্থাৎ জালিকদের স্থান নির্দেশ করিতেছেন মধ্যম সংকর পর্যায়ে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ তীবর (ধীবর ?) ও কৈবর্তদের স্থান নির্দেশ করিতেছেন অসৎশূদ্র পর্যায়ে; এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই ইঙ্গিত এই যে, ইহারা মৎস্যজীবি—কৃষিজীবি নন। তবে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-রচয়িতা ইহাদের যে উদ্ভব-ব্যাখ্যা দিতেছেন, এই জাতীয় ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়াই পরবর্তীকালে কৈবর্ত এবং মাহিষ্যদের এক এবং অভিন্ন বলিয়া দাবি সমাজে প্রচলিত ও স্বীকৃত হয়। যাহাই হউক, বর্তমানকালে পূর্ববঙ্গের হালিক দাস এবং পরাশর দাস এবং হুগলী-বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের চাষী কৈবর্তরা নিজেদের মাহিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন; আবার পূর্ব-বঙ্গে (ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, ঢাকা অঞ্চলে) মৎস্যজীবি ধীবর ও জালিকরাও কৈবর্ত বলিয়া পরিচিত। বুঝা যাইতেছে, কালক্রমে কৈবর্তদের মধ্যে দুইটি বিভাগ রচিত হয়, একটি প্রাচীনকালের ন্যায় মৎস্যজীবিই থাকিয়া যায় (যেমন পূর্ববঙ্গে আজও), আর একটি কৃষি (হালিক) বৃত্তি গ্রহণ করিয়া মাহিষ্যদের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। বল্লালচরিতে যে বলা হইয়াছে, রাজা বল্লালসেন কৈবর্ত (এবং মালাকার, কুম্ভকার ও কর্মকার) দিগকে সমাজে উন্নীত করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে কৈবর্তদের এক শ্রেণীর বৃত্তি পরিবর্তনের (চাষী-হালিক হওয়ার) এবং মাহিষ্যদের সঙ্গে অভিন্নতা দাবির যোগ থাকা অসম্ভব নয়।

বর্ণ ও শ্রেণী

উপরোক্ত উভয়পুরাণের মতেই করণ-কায়স্থ এবং বৈদ্য-অম্বষ্ঠদের পরেই গোপ, নাপিত, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার, শংখকার, কংসকার, তন্তুবায়-কুবিন্দক, মোদক এবং তাম্বুলীদের স্থান। গন্ধবণিক, তৈলিক তৌলিক (সুপারী-ব্যবসায়ী), দাস (চাষী), এবং বারজীবি (বারুই), ইঁহাদেরও সদ্যোক্ত জাতগুলির সমপর্যায়ে গণ্য করা হইত। ইহাদের মধ্যে কৃষিজীবি দাস ও বারজীবি, এবং শিল্পজীবি কুম্ভকার, কর্মকার, শংখকার, কংসকার ও তন্তুবায় ছাড়া আর কাহাকেও ধনোৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যায় না। গোপ, নাপিত, মালাকার, ইহারা সমাজ-সেবক মাত্র। মোদক, তাম্বুলী (তামলী) তৈলিক-তৌলিক এবং গন্ধবণিকেরা ব্যবসায়ী শ্রেণী, এবং সেই হেতু অর্থোৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে; তবে ইঁহাদের মধ্যে মোদক বা ময়রার ব্যবসায় বিস্তৃত বা যথাযথভাবে ধনোৎপাদক ছিল, এমন বলা যায় না। গুবাক, পান এবং গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায় যে সুবিস্তৃত ছিল তাহা অন্যত্র নানা প্রসঙ্গে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। করণ ও অম্বষ্ঠদের বৃত্তিও ধনোৎপাদক বৃত্তি নয়। করণরা সোজাসুজি কেরাণী, পুস্তপাল, হিসাবরক্ষক, দপ্তর-কর্মচারী; অম্বষ্ঠ-বৈদ্যরা চিকিৎসক। উভয়ই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সাক্ষ্য হইতে স্পষ্টই মনে হয়, স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিকেরা—সুবর্ণবণিকেরা হয়ত ইঁহাদের অন্তর্গত ছিলেন—আগে উত্তম সংকর বা সৎশূদ্র পর্যায়েই গণ্য হইতেন, কিন্তু বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ রচনাকালে তাঁহারা 'পতিত' হইয়া গিয়াছেন। দ্বাদশ শতকে ভবদেবভট্টও সুবর্ণকারদের নিম্নজাত পর্যায়ে ফেলিয়াছেন।[১] বল্লালচরিতে যে বলা হইয়াছে বল্লালসেন কোনও কোনও বণিক, বিশেষভাবে সুবর্ণবণিকদের সমাজে 'পতিত'

করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এই ইঙ্গিতের যোগ থাকা অসম্ভব নয়। অন্ততঃ এইটুকু সুস্পষ্ট যে, কোনও না কোনও কারণে অর্থোৎপাদক শিল্পী ও বণিক সম্প্রদায়ের কোনও কোনও অংশ সমাজে 'পতিত' হইয়াছিল, তাহা রাষ্ট্রের নির্দেশে বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক।

আশ্চর্য এই যে, সমাজের ধনোৎপাদক অনেক শিল্পী, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের লোকেরাই সৎশূদ্র বা উত্তম সংকর বলিয়া গণিত হন নাই। ইঁহাদের মধ্যে স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, তৈলকার, চিত্রকার, সূত্রধার, শৌণ্ডিক বা শুঁড়ি, তক্ষণ, ধীবর-জালিক-কৈবর্ত, অট্টালিকাকার, কোটক প্রভৃতি জাতের নাম করিতেই হয়; ইঁহারা সকলেই মধ্যম সংকর বা অসৎশূদ্র পর্যায়ের। যুঙ্গি-যুগীরা এবং চর্মকারেরাও অর্থোৎপাদক শিল্পী শ্রেণীর অন্যতম: ইঁহারাও অসৎশূদ্র বা মধ্যম সংকর। নট সেবক মাত্র, ভবদেবভট্টের মতে নট নর্তক। চর্মকাব, শুঁড়ি, রজক, ইহারা সকলেই নিম্নজাতের লোক। ইঁহারা প্রয়োজনীয় সামাজিক স্তর সন্দেহ নাই, কিন্তু শৌণ্ডিক ও চর্মকার ছাড়া অন্য দুইটিকে ঠিক অর্থনৈতিক স্তরের লোক বলা চলে কিনা সন্দেহ। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে চর্মকারেরা একেবারে অন্ত্যজ পর্যায়ে পরিগণিত —তাঁহাদের বৃত্তির জন্য সন্দেহ নাই। অসৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত মল্ল (= মালো, মাঝি ?) এবং রজক প্রয়োজনীয় সমাজ-শ্রমিক। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে মল্ল অন্ত্যজ পর্যায়ভুক্ত।

সমাজ-শ্রমিকেরা কিন্তু প্রায় অধিকাংশই অন্ত্যজ বা মেচ্ছ পর্যায়ে—বর্ণাশ্রমের বাহিরে তাঁহাদের স্থান। চণ্ডাল, বরুড় (বাউড়ী), ঘট্টজীবি (পাটনী ?), ডোলাবাহী (দুলিয়া, দুলে), মল্ল (মালো ?), হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদী ?)—ইঁহারা সকলেই ত

সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় শ্রমিক-সেবক, অথচ ইহাদের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল সমাজের একেবারে নিম্নতম স্তরে। অন্ত্যজ পর্যায়ের আর একটি বর্ণের খবর দিতেছেন বন্দ্যঘটীয় আর্তিহর পুত্র সর্বানন্দ (১১৬০)। ইহারা বেদে বা বাদিয়া; বাদিয়ারা সাপখেলা দেখাইয়া বেড়াইত (ভিক্ষার্থং সর্পধারিণি বাদিয়া ইতি খ্যাতে)। চর্যাগীতিগুলি হইতে ডোম, চণ্ডাল, শবর প্রভৃতি নিম্ন অন্ত্যজ বর্ণ ও কৌমের নরনারীর বৃত্তির একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়—বাঁশের তাঁত ও চাঙারি বোনা, কাঠ কাটা, নৌকার মাঝিগিরি করা, নৌকা ও সাঁকো তৈরী করা, কাঠ কাটা, মদ তৈরী করা, জুয়া খেলা, তুলা ধোনা, হাতী পোষা, পশু শীকার, নৃত্যগীত ইত্যাদি ছিল ইহাদের বৃত্তি। এই সব বস্তু আশ্রয় করিয়াই বৌদ্ধ সহজ-সাধকদের গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিপিতে সৎ ও অসৎ শূদ্র উভয় পর্যায়েরই কয়েকজন ব্যক্তির সাক্ষাৎ মিলিতেছে। কয়েকটি অজ্ঞাতনামা গোপ, জনৈক কাংসকার গোবিন্দ, নাপিত গোবিন্দ, এবং দন্তকার রাজবিগা—ইহারা সৎশূদ্র পর্যায়ের সন্দেহ নাই, কিন্তু রজক সিরুপা অসৎশূদ্র পর্যায়ের; নাবিক জোজে কোন্ পর্যায়ের বলা যাইতেছে না।

মনে রাখা দরকার, বর্ণ ও শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধের যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেল তাহা একান্তই আদিপর্বের শেষ অধ্যায়ের। পূর্ববর্তী বিভিন্ন পর্যায়ে এ-পরিচয় খুব সুস্পষ্ট নয়। তবু, প্রাচীনতর স্মৃতি ও অর্থশাস্ত্রগুলিতে বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর সম্বন্ধের একটা চিত্র মোটামুটি ধরিতে পারা যায়, এবং অনুমান করা সহজ যে, অন্ততঃ গুপ্ত আমল হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা দেশেও অনুরূপ সম্বন্ধ প্রবর্তিত হইয়াছিল।

সেখানেও দেখিতেছি, অনেকগুলি অর্থোৎপাদক শ্রেণী—তাহাদের মধ্যে স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, তৈলকার, গন্ধবণিক ইত্যাদিরাও আছেন—বর্ণ হিসাবে সমাজে ইহারা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া নাই, বরং কতকটা অবজ্ঞাতই। আর, সমাজ-শ্রামক যাঁহারা তাঁহারা তো বরাবরই নিম্নবর্ণস্তরে, কেহ কেহ একেবারে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পর্যায়ে। তবে, সমাজ যতদিন পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যপ্রধান ছিল, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যই ছিল সামাজিক ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় ততদিন পর্যন্ত বর্ণস্তর হিসাবে না হউক, অন্ততঃ রাষ্ট্রে এবং সেই হেতু সামাজিক মর্যাদায় বণিক-ব্যবসায়ীদের বেশ প্রতিষ্ঠাও ছিল। কিন্তু সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে বাঙালী সমাজ প্রধানতঃ কৃষি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্পনির্ভর হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে, এবং তখন হইতেই অর্থোৎপাদক ও শ্রমিক শ্রেণীগুলি ক্রমশঃ সামাজিক মর্যাদাও হারাইতে আরম্ভ করে। হাতের কাজই ছিল যাঁহাদের জীবিকার উপায় তাঁহারা স্পষ্টতই সমাজের নিম্নতর ও নিম্নতম বর্ণস্তরে; অথচ বুদ্ধিজীবী ও মসীজীবী যাঁহারা তাঁহারাই উপরের বর্ণস্তর অধিকার করিয়া আছেন। এমন কি, কৃষিজীবি দাস-সম্প্রদায়ও অনেক ক্ষেত্রে বণিক-ব্যবসায়ী এবং অতি প্রয়োজনীয় সমাজ-শ্রমিক সম্প্রদায়গুলির উপরের বর্ণস্তরে অধিষ্ঠিত। মধ্য ও উত্তর ভারতে বর্ণস্তরের দৃঢ় ও অনমনীয় সংবদ্ধতা এবং সমাজের অর্থোৎপাদক ও শ্রমিক শ্রেণীস্তরগুলি সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞা খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতেই দেখা দিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর পারস্পরিক সম্বন্ধের বিরোধও ক্রমশঃ তীব্রতর হইতেছিল। বাংলা দেশে, মনে হয়, মোটামুটিভাবে পাল আমল পর্যন্ত এই বিরোধ খুব তীব্র হইয়া দেখা দেয় নাই; পাল আমলের শেষের দিকে, বিশেষ ভাবে সেন-বর্মন-আমলে উত্তর ও মধ্যভারতের বর্ণ ও শ্রেণীগত

সামাজিক আদর্শ, অর্থাৎ এই দুয়ের সুস্পষ্ট বিরোধ রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল।

বর্ণ ও কৌম

উল্লিখিত তালিকাগুলিতে এবং সমসাময়িক লিপি ও স্মৃতিগ্রন্থে কতকগুলি আদিবাসি আরণ্য ও পার্বত্য কোমের এবং বিদেশী বা ভিন্‌-প্রদেশী কোমের নাম পাওয়া যাইতেছে : যথা, ভিল্ল, মেদ, আভীর কোল, পৌণ্ড্রক (পোদ ?), পুলিন্দ, পুক্কশ, খস, খর, কম্বোজ, যবন, সুহ্ম, শবর, অন্ধ্র ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ভিল্লদের সৎশূদ্র পর্যায়ে কি করিয়া গণ্য করা হইয়াছিল বলা কঠিন : ভবদেব ইঁহাদের মেদদের সঙ্গে বিন্যস্ত করিয়াছেন অন্ত্যজ পর্যায়ে। পৌণ্ড্রকরা অসৎশূদ্র পর্যায়ে পরিগণিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু আর কোনও কোমের পক্ষেই সে-সৌভাগ্য লাভ ঘটে নাই ; বাকী সমস্ত কোমই হয় অন্ত্যজ, না হয় ম্লেচ্ছ পর্যায়ে। কোলেরা পুরাণোক্ত কোল্ল সন্দেহ নাই। পুরাণোক্ত কোল্ল ভীল্লের দর্শন তাহা হইলে এখানেও পাওয়া যাইতেছে। পুলিন্দরাও প্রাচীন কোম এবং ইঁহাদের উল্লেখ বল্লালসেনের নৈহাটি লিপিতেও পাওয়া যাইতেছে। খসদের উল্লেখ পালদের লিপিতেই পাওয়া যাইতেছে গৌড়-মালব-কুলিক-হূণ-কর্ণাট-লাট প্রভৃতি বেতনভুক্‌ সৈন্যদের সঙ্গে। খর, পুক্কশ, ইঁহারাও পুরাণোক্ত আদিবাসি কোম। আভীররা বিদেশাগত প্রাচীন কোম এবং ভারতেতিহাসে সুবিদিত। বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে ইঁহারা মধ্যমসংকর পর্যায়ভুক্ত। আর কোনও বিদেশী কোমের পক্ষে কিন্তু এতটা সৌভাগ্যলাভ ঘটে নাই। কম্বোজরা উত্তর-পশ্চিম ভারত-সীমান্তের সুপরিচিত কোম হইতে পারে, অথবা আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের বা তিব্বত অঞ্চলের পার্বত্য কোমও হইতে পারে ; শেষোক্ত কোম হওয়াই

অধিকতর সম্ভব। এক কম্বোজ রাজবংশ বাংলাদেশে কিছুকাল রাজত্বও করিয়াছিলেন। যবনরা বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মুসলমান। অন্ধ্রদের কথা তো পালপর্বে নিম্নতম স্তরের জাতগুলির আলোচনা প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে। সুহ্মরা বাংলার প্রাচীনতম আদিবাসি কোমগুলির অন্যতম। শবররাও তাহাই। ইঁহাদের কথাও পালপর্বে বলা হইয়াছে, এবং বল্লালসেনের নৈহাটি লিপিতে পুলিন্দদের সঙ্গে ইঁহাদেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শবর-নারীদের মতন পুলিন্দ নারীরাও গুঞ্জাবীচির মালা পরিতে খুব ভালবাসিতেন ; নৈহাটি লিপিতে এ-কথার ইঙ্গিত আছে। যাহা হউক, উপরোক্ত বিশেষণ হইতে বুঝা যাইতেছে, হিন্দুবর্ণ-সমাজে ধীরে ধীরে যে স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া চলিতেছিল তাহার ফলে কোন কোনও আদি বাঙালী কোম এবং বিদেশী কোম বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, যেমন পৌণ্ড্রক এবং আভীররা এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সাক্ষ্য সত্য হইলে ভিল্লরাও ; কোনও কোনও আদিবাসি কোম বর্ণাশ্রমের বাহিরে অন্ত্যজ পর্যায়ে স্থান পাইয়াছিল, যেমন, মেদ, ভিল্ল, কোল প্রভৃতি ; আবার কেহ কেহ একেবারে ম্লেচ্ছ পর্যায়ে পুক্কশ, খস, খর, কম্বোজ ; যবনদের সঙ্গে, যেমন সুহ্ম, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি। অনুমান করা কঠিন নয়, ব্যাধ, হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদী ?), চণ্ডাল, মল্ল, ডোলাবাহী (দুলিয়া, দুলে), ঘট্টজীবি (পাটনী ?), বরুড় (বাউড়ী) প্রভৃতিরাও আদিবাসি কোম। হিন্দু সমাজের সামাজিক স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়ার যুক্তিপদ্ধতিতে ইঁহারাও ক্রমশঃ সমাজের নিম্নতম স্তরে স্থান পাইয়াছিল। পাল আমলের লিপিগুলিতে "মেদান্ধ্রচণ্ডালপর্যন্তান্" পদাংশ হইতে মনে হয়, এই স্বাঙ্গীকরণ পালযুগেই সুপরিণতি লাভ করিয়া গিয়াছিল। সেন-আমলে সামাজিক নিম্নতম স্তর তো রাষ্ট্রের

দৃষ্টির অন্তর্ভুক্তই ছিল না, অন্ততঃ রাজকীয় দলিলপত্রে ইঁহাদের কোনও উল্লেখ নাই।

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্যান্য বর্ণের সম্বন্ধ

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্যান্য বর্ণ উপবর্ণের সম্বন্ধ ও যোগাযোগ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্যের সংবাদ লওয়া যাইতে পারে। প্রথমেই আহার-বিহার লইয়া বিধিনিষেধের কথা বলা যাক। ভবদেবভট্টের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ এ-সম্বন্ধে প্রামাণিক ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সমস্ত বিধিনিষেধের উল্লেখের প্রয়োজন নাই; দুই চারিটি নমুনাস্বরূপ উল্লেখই যথেষ্ট।

রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ, ভিল্ল, চণ্ডাল, পুক্কশ, কাপালিক, নর্তক, তক্ষণ, সুবর্ণকার, শৌণ্ডিক এবং পতিত ও নিষিদ্ধ বৃত্তিজীবি ব্রাহ্মণদেব দ্বারা স্পৃষ্ট বা পক্ক খাদ্য ব্রাহ্মণদের পক্ষে ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল: এই নিষেধ অমান্য করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। শূদ্রপক্ক অন্ন ভক্ষণও নিষিদ্ধ ছিল; নিষেধ অমান্য করিলে পূর্ণ কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল; প্রাচীন স্মৃতিকারদের এই বিধান ভবদেবও মানিয়া লইয়াছেন, তবে টীকা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন: ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়পক্ক অন্ন গ্রহণ করিলে কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্তের অর্ধেক পালন করিলেই চলিবে; আর, বৈশ্যপক্ক অন্ন গ্রহণ করিলে তিন-চতুর্থাংশ। ক্ষত্রিয় যদি শূদ্রপক্ক অন্ন গ্রহণ করে তাহাকে পূর্ণ কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, কিন্তু বৈশ্যপক্ক অন্ন গ্রহণ করিলে অর্ধেক প্রায়শ্চিত্ত করিলেই চলিবে। বৈশ্য শূদ্রপক্ক অন্ন গ্রহণ করিলেও অর্ধেক প্রায়শ্চিত্তেই চলিতে পারে। শূদ্রহস্তে তৈলপক্ক ভর্জিত (শস্য) দ্রব্য, পায়স, কিংবা আপৎকালে শূদ্রপক্ক দ্রব্য ইত্যাদি ভোজন করিতে ব্রাহ্মণের কোনও বাধা নাই; শেষোক্ত অবস্থায় মনস্তাপপ্রকাশরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই

দোষ কাটিয়া যায়। ভবদেবের সময়ে দ্বিজবর্ণের মধ্যে বাংলাদেশে এই সব বিধিনিষেধ কিছু স্বীকৃত ছিল, কিছু নূতন গড়িয়া উঠিতেছিল বলিয়া মনে হইতেছে। শূদ্রের পাত্রে রক্ষিত অথবা শূদ্রদত্ত জলপানও ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, অবশ্য স্বল্প প্রায়শ্চিত্তেই সে দোষ কাটিয়া যাইত; তবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র কেহই চণ্ডাল ও অন্ত্যজস্পৃষ্ট বা তাঁহাদের পাত্রে রক্ষিত জল পান করিতে পারিতেন না, করিলে পুরাপুরি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। নট ও নর্তকদের সম্বন্ধে ভবদেবের বিধিনিষেধ দেখিয়া মনে হয়, উচ্চতর বর্ণসমাজে ইহারা সম্মানিত ছিলেন না। বৃহদ্ধর্মপুরাণে নটেরা মধ্যম সংকর পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু সমসাময়িক অন্য প্রমাণ হইতে মনে হয়, যাঁহারা নট-নর্তকের বৃত্তি অনুসরণ করিতেন সমাজে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা কম ছিল না। নট গাঙ্গো বা গাঙ্গোক রচিত কয়েকটি শ্লোক সুপ্রসিদ্ধ সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী" জয়দেবের পত্নী প্রাকবিবাহ জীবনে দেবদাসী-নটী ছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। জয়দেব নিজেও সঙ্গীতপারঙ্গম ছিলেন; সেক শুভোদয়া গ্রন্থে এই সম্বন্ধে একটি গল্পও আছে।

অন্ত্যজ জাতেরা বোধ হয় এখনকার মত তখনও অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ডোম্ব-ডোম্বীরা যে ব্রাহ্মণদের অস্পৃশ্য ছিলেন তাহার একটু পরোক্ষ প্রমাণ চর্যাগীতে পাওয়া যায় (১০ নং গীত)। ভবদেবের প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ গ্রন্থের সংসর্গ প্রকরণাধ্যায়ে অস্পৃশ্য স্পর্শদোষ সম্বন্ধে নাতিবিস্তর আলোচনা দেখিয়াও মনে হয়, স্পর্শবিচার সম্বন্ধে নানা-প্রকার বিধিনিষেধ সমাজে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল।

বিবাহব্যাপারেও অনুরূপ বিধিনিষেধ যে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার পরিচয়ও সুস্পষ্ট। পালপর্বে এই প্রসঙ্গে রাজা লোকনাথের পিতৃ

ও মাতৃবংশের পরিচয়ে দেখা গিয়াছে, উচ্চবর্ণীয় পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণীয় নারীর বিবাহ, ব্রাহ্মণ বর ও শূদ্রকন্যায় বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। সবর্ণে বিবাহই সাধারণ নিয়ম ছিল, এই অনুমান সহজেই করা চলে; কিন্তু সেন-বর্মণ-দেব আমলেও চতুর্বর্ণের মধ্যে, উচ্চবর্ণ বর ও নিম্নবর্ণ কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই, এমন কি শূদ্রকন্যার ব্যাপারেও নহে; ভবদেব ও জীমূতবাহন উভয়ের সাক্ষ্য হইতেই তাহা জানা যায়। ব্রাহ্মণের বিদগ্ধা শূদ্রা স্ত্রীর কথা ভবদেব উল্লেখ করিয়াছেন; জীমূতবাহন ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের উত্তরাধিকারাগত রীতিনিয়মের কথা বলিয়াছেন, যজ্ঞ ও ধর্মানুষ্ঠান ব্যাপারে সমবর্ণীয় স্ত্রী বিদ্যমান না থাকিলে অব্যবহিত নিম্নবর্তী বর্ণের স্ত্রী হইলেও চলিতে পারে, এইরূপ বিধানও দিয়াছেন। এইসব উল্লেখ হইতে মনে হয়, শূদ্রবর্ণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ পুরুষের যে কোনও নিম্নবর্ণে বিবাহ সমাজে আজিকার মতন একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া যায় নাই। অবশ্য কোনও পুরুষই উচ্চবর্ণে বিবাহ করিতে পারিতেন না। তবে, দ্বিজবর্ণের পক্ষে শূদ্রবর্ণে বিবাহ সমাজে নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছিল, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, এই প্রথা যে নিন্দনীয় এ সম্বন্ধে মনু ও বিষ্ণুস্মৃতির মত উল্লেখ করিয়া জীমূতবাহন বলিতেছেন, শঙ্খস্মৃতি দ্বিজবর্ণের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যা স্ত্রীর কথাই বলিয়াছেন, শূদ্রা স্ত্রীর কথা উল্লেখই করেন নাই। যজ্ঞ ও ধর্মানুষ্ঠানে স্ত্রীর অধিকার সম্বন্ধে জীমূতবাহনের যে মত একটু আগে উদ্ধার করা হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে জীমূতবাহন মনুর মত সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, সবর্ণীয় স্ত্রীই এই অধিকারের অধিকারী, তবে সবর্ণীয়া স্ত্রী বিদ্যমান না থাকিলে ক্ষত্রিয়া স্ত্রী যজ্ঞভাগী হইতে পারেন, কিন্তু বৈশ্য বা শূদ্র নারী ব্রাহ্মণের বিবাহিতা হইলেও তিনি তাহা হইতে পারেন না, অর্থাৎ যথার্থ স্ত্রীর অধিকারী তিনি হইতে পারেন না।

এই টিপ্পনী হইতে স্বভাবতই এই অনুমান করা চলে যে, ব্রাহ্মণ বৈশ্যানী এমন কি শূদ্রানীও বিবাহ করিতে পারিতেন, করিতেনও, কিন্তু তাঁহারা সর্বথা স্ত্রীব অধিকার লাভ করিতেন না। এই অনুমানের প্রমাণ জীমূতবাহনই অন্যত্র দিতেছেন; বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্রাণীব গর্ভে সন্তানের জন্মদান করিলে তাহাতে নৈতিক কোনও অপরাধ হয় না; স্বল্প সংসর্গদোষ তাহাকে স্পর্শ করে মাত্র, এবং নামমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সে অপরাধ কাটিয়া যায়। শূদ্রাণীর সঙ্গে বিবাহ যে সমাজে ক্রমে নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছিল তাহা জীমূত-বাহনের সাক্ষ্য হইতে বুঝা যাইতেছে; বিভিন্ন বর্ণেব স্ত্রীদের মর্যাদা সম্বন্ধেও যে পার্থক্য করা হইতেছিল তাহাও পরিষ্কার, বিশেষতঃ শূদ্রা বিবাহিতা পত্নী সম্বন্ধে। বর্ণাশ্রম বহিষ্কৃত যে-সব জাত ছিল তাঁহাদের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধের কোনও প্রশ্ন ·বিবেচনার মধ্যেই আসে নাই, অর্থাৎ তাহা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল, এমন কি শূদ্রদের পক্ষেও।

দ্বিজবর্ণ (এবং বোধ হয় উচ্চ জাতের শূদ্রবর্ণের মধ্যেও) সপিণ্ড, সগোত্র এবং সমান-প্রবরের বিবাহই সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল; ভবদেব ভট্টের সম্বন্ধ-বিবেক গ্রন্থে তাহার উপর বেশ জোরই দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, এবং প্রাজাপাত্য বিবাহে কন্যা বরের মায়ের দিক হইতে পঞ্চম পুরুষের মধ্যে কিম্বা পিতাব দিক হইতে সপ্তম পুরুষের মধ্যে হইলে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বর এবং কন্যা সগোত্র কিম্বা সপ্রবরের হইলেও বিবাহ হইতে পারিত না। আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহে কন্যা বরের মায়ের দিক হইতে তিন পুরুষ, কিম্বা পিতার দিক হইতে পঞ্চম পুরুষের বাহিরে হইলে বিবাহ হইতে পারিত, কিন্তু তাঁহারা সমাজে শূদ্র পর্যায়ে পতিত বলিয়া গণ্য হইতেন।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, এইসব বর্ণগত বিধি-নিষেধ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেই সবিশেষ প্রযোজ্য ছিল, এবং তাহাও ব্রাহ্মণের সঙ্গে নিম্নতর, এবং বিশেষভাবে নিম্নতম বর্ণের আহার-বিহার-বিবাহ ব্যাপারে যোগাযোগ সম্বন্ধে। কালক্রমে এই সব বিধি-নিষেধই সামাজিক আভিজাত্যের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়ায় এবং বৃহত্তব, সমাজে বিস্তৃত হইয়া অন্যান্য বর্ণ ও জাতের মধ্যেও স্বীকৃতি লাভ করে। শেষ পর্বে আসিয়া যে-অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তাহা তো সাম্প্রতিক কালে বাঙালী হিন্দুসমাজে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যাহা হউক, সমসাময়িক স্মৃতি-গ্রন্থে সেন-বর্মণ-দেব আমলের বর্ণগত বিধিনিষেধের যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায়, এই সময়েই ব্রাহ্মণেরা বৃহত্তর সমাজের অন্যান্য বর্ণ ও জাত হইতে প্রায় পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। এক প্রান্তে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, অন্যপ্রান্তে স্বাঙ্গীকৃত ও স্বাঙ্গীক্রিয়মান স্পর্শচ্যুত অধিকারলেশহীন অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়, আর মধ্যস্থলে বৃহৎ শূদ্র সম্প্রদায়। প্রত্যেকের মধ্যে দৃঢ় ও দুরতিক্রম্য প্রাচীর। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ও নানা ভৌগোলিক এবং অন্যান্য বিভেদ-প্রাচীরে বিভক্ত, আহার-বিহার-বিবাহ-ব্যাপারে নানা বিধিনিষেধের সূত্রে দৃঢ় করিয়া বাধা, যোগাযোগের বাধাও বিচিত্র। বৃহৎ শূদ্র সম্প্রদায়ও নানা জাতে নানা স্তরে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক স্তর দৃঢ় ও দুর্লঙ্ঘ্য সীমায় সীমিত। অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ পর্যায় তো একান্তই রাষ্ট্র ও সমাজ-দৃষ্টির বাহিরে।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের উল্লেখ ভবদেবভট্ট, জীমূতবাহন ও অন্যান্য স্মৃতিলেখকরা বারবার করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা একান্তই ঐতিহ্য-সংস্কারগত উল্লেখ বলিয়া মনে হয়—উত্তর-ভারতীয় প্রাচীনতর স্মৃতিকথিত বর্ণবিন্যাসের প্রথাগত অনুকরণ। পূর্বতন কালে অথবা

বাংলার আদি স্মৃতিগ্রন্থগুলির সমসাময়িক কালে এইদেশে ক্ষত্রিয় ও ও বৈশ্য বর্ণের উপস্থিতির কোনও নিঃসংশয় সাক্ষ্য আজও আমরা জানি না।

প্রাচীন বাংলায় বর্ণবিন্যাসের পরিণতির কথা বলিতে গিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Bengal, Vol. I গ্রন্থে একটি উক্তি করা হইয়াছে ; উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

"An important factor in the evolution of this final stage is the growing fiction that almost all non-Brahmanas were Sudras. The origin of this fiction is perhaps to be traced to the extended significance given to the term Sudra in the Puranas, where it denotes not only the members of the fourth caste, but also those members of the three higher castes who accepted any of the heretical religions or were influenced by Tantric rites. The predominance of Buddhism and Tantric Saktism in Bengal as compared with other parts of India, since the eighth century A. D. perhaps explains why all the notable castes in Bengal were degraded in the Brihad-dharma Purana and other texts as Sudras and the story of Vena and Pritha might be mere echo of a large scale reconversion of the Buddhists and Tantric elements of the population into the orthodox Brahmanical fold." (p. 578).

বর্ণ ও রাষ্ট্র

বিভিন্ন পর্বে বর্ণ-বিন্যাসের সঙ্গে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের সম্বন্ধের কথা না বলিয়া বর্ণবিন্যাসপ্রসঙ্গ শেষ করা উচিত হইবে না।

বাংলাদেশে গুপ্তাধিপত্যের আগে এই সম্বন্ধের কোনও কথাই বলিবার উপায় নাই ; তথ্যই অনুপস্থিত। গুপ্তাধিকারের কালে ভুক্তির রাষ্ট্রযন্ত্রে অথবা বিষয়াধিকরণে কিম্বা স্থানীয় অন্য রাষ্ট্রাধিকরণের

কর্তৃপক্ষদের মধ্যে যাঁহাদের নামের তালিকা পাইতেছি তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রায় নাই বলিলেই চলে। ভুক্তিপতি বা উপরিকদের মধ্যে যাঁহাদের দেখা মিলিতেছে তাঁহারা কেহ চিরাতদত্ত, কেহ ব্রহ্মদত্ত, কেহ জয়দত্ত, কেহ রুদ্রদত্ত, কেহ কুলবৃদ্ধি ইত্যাদি ; ইহাদের একজনও ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয় না। বিষয়পতিরা বা তৎস্থানীয়রা কেহ বেত্রবর্মণ, কেহ স্বয়ম্ভূদেব, কেহ শণ্ডক ; ইহাদের মধ্যে বেত্রবর্মণ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করিতে পারেন ; স্বয়ম্ভূদেব সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন, ব্রাহ্মণ হইলে হইতেও বা পারেন ; শণ্ডক যে অব্রাহ্মণ এ অনুমান সহজেই করা চলে। তারপরেই নিঃসন্দেহে যাঁহারা রাজকর্মচারী তাঁহারা হইতেছেন পুস্তপাল এবং জ্যেষ্ঠ বা প্রথম কায়স্থ। ইহাদের কাহারও নাম শাম্বপাল, কাহারও কাহারও নাম দিবাকরনন্দী, পত্রদাস, দুর্গাদত্ত, অর্কদাস, করণ-কায়স্থ নরদত্ত, স্কন্দপাল ইত্যাদি। এই সব নামও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের, সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অন্ততঃ একজন করণ-কায়স্থ নরদত্ত যে সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, সে-পরিচয় পাইতেছি। কুমারামাত্যদের মধ্যে একটি নাম পাইতেছি বেত্রজ্জস্বামী—যিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া কতকটা নিঃসংশয়ে বলা চলে। পুস্তপাল ও জ্যেষ্ঠ বা প্রথম কায়স্থদের সঙ্গে যাঁহারা স্থানীয় অধিকরণের রাষ্ট্রকার্য পরিচালনায় সহায়তা করিতেন তাঁহারা হইতেছেন নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ এবং প্রথম কুলিক ; ইহাদের নামের তালিকায় পাওয়া যায় ধৃতিপাল, বন্ধুমিত্র, ধৃতিমিত্র, রিভুপাল, স্থাণুদত্ত, মতিদত্ত, ইত্যাদি ব্যক্তিকে ; ইহাদের একজনকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না। বস্তুতঃ, এই সব নামাংশ বা পদবী পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েতর অন্য ভদ্রবর্ণের।

ষষ্ঠ সপ্তম শতকে (পূর্ব) বঙ্গেও এই একই অবস্থা দেখিতেছি। শুধু, সুবর্ণবীথি অন্তর্গত বারকমণ্ডলের বিষয়াধিনিযুক্তক ব্যক্তিদের মধ্যে দুই-

বার দুই জনের নাম পাইতেছি : গোপালস্বামী ও বৎসপালস্বামী। এই দুইজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। জ্যেষ্ঠকায়স্থ, পুস্তপাল ইত্যাদির নামের মধ্যে পাইতেছি বিনয়সেন, নয়ভূতি, বিজয়সেন, পুরদাস ইত্যাদিকে—ইঁহারা অব্রাহ্মণ, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

অর্থাৎ, সপ্তম শতক পর্যন্তও রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের কোনও প্রাধান্য দেখা যাইতেছে না; বরং পরবর্তী কালে যাঁহারা করণ-কায়স্থ, অম্বষ্ঠ-বৈদ্য ইত্যাদি সংকর শূদ্রবর্ণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন তাঁহাদের প্রাধান্যই দেখিতেছি বেশী, বিশেষভাবে করণ-কায়স্থদের। শ্রেণী হিসাবে শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রাধান্যও যথেষ্ট দেখা যাইতেছে; বর্ণ হিসাবে ইঁহারা বৈশ্যবর্ণ বলিয়া গণিত হইতেন কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বৈশ্য বলিয়া কোথাও ইঁহাদের দাবি সমসাময়িক কাল বা পরবর্তী কালেও কোথাও দেখিতেছি না, এইটুকুই মাত্র বলা যায়। অনুমান হয়, পরবর্তীকালে যে-সব শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী শূদ্র উত্তম ও মধ্যম সংকর বর্ণ পর্যায়ভুক্ত বলিয়া পাইতেছি তাঁহারাই এই যুগে শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক ইত্যাদির বৃত্তি অনুসরণ করিতেন। বুঝা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থা বিস্তৃতি লাভ করিলেও রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণেরা এখনও প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই—তাঁহারা সম্ভবতঃ এখনও নিজেদের বর্ণানুযায়ী বৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। অন্যান্য বর্ণের লোকদের সম্পর্কে মোটামুটি বলা যায় যে তাঁহারাও নিজেদের নির্দিষ্ট বৃত্তিসীমা অতিক্রম করেন নাই। রাষ্ট্রে করণ-কায়স্থদের প্রতিপত্তি বৃত্তিগত স্বাভাবিক কারণেই; শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ীদের প্রতিপত্তির কারণ অর্থনৈতিক। শেষোক্ত কারণের ব্যাখ্যা অন্যান্য প্রসঙ্গে একাধিক বার করিয়াছি।

কিন্তু, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও বর্ণব্যবস্থার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের

সক্রিয় পোষকতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ক্রমশঃ তাঁহারা প্রতিপত্তিশীল হইয়া উঠিতে আরম্ভ করেন; ভূমিদান অর্থদান ইত্যাদি কৃপালাভের ফলে অনেক ব্রাহ্মণ ক্রমশ: ব্যক্তিগতভাবে ধনসম্পদের অধিকারীও হইতে থাকেন। এই সামাজিক প্রতিপত্তি রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হইতে বিলম্ব হয় নাই। করণ-কায়স্থেরাও রাজসরকারে চাকুরী করিয়া করিয়া রাষ্ট্রের কৃপালাভে বঞ্চিত হন নাই; গ্রামে, বিষয়াধিকরণে, ভুক্তির রাষ্ট্রকেন্দ্রে সর্বত্র যাঁহারা মহত্তর কুটুম্ব ইত্যাদি বলিয়া গণ্য হইতেছেন, রাজকার্যে সহায়তার জন্য যাঁহারা আহুত হইতেছেন, তাহাদের মধ্যে করণ-কায়স্থ এবং অন্যান্য 'ভদ্র' বর্ণের লোকই সংখ্যায় বেশী বলিয়া মনে হইতেছে। প্রচুর ভূমির অধিকারী রূপে, শিল্পব্যবসায়ে অর্জিত ধনবলে, সমাজের সংস্কার, সংস্কৃতি ও বর্ণ ব্যবস্থার নায়করূপে যে সব বর্ণ সমাজে প্রতিপত্তিশীল হইয়া উঠিতেছেন তাঁহারা রাষ্ট্রে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হইবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। রাষ্ট্রেরও স্বার্থ হইল সেইসব প্রতিপত্তিশালী বর্ণ বা বর্ণ-সমূহকে সমর্থকরূপে নিজের সঙ্গে যুক্ত রাখা।

সাধারণতঃ অধিকাংশ লোকই নিজেদের বর্ণবৃত্তি অনুশীলন করিতেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগত রুচি, প্রভাব-প্রতিপত্তি-কামনা, অর্থনৈতিক-প্রেরণা ইত্যাদির ফলে প্রত্যেক বর্ণেরই কিছু কিছু লোক বৃত্তি পরিবর্তন করিত, তাহাও সত্য। স্মৃতিগ্রন্থাদিতে যে নির্দেশই থাকুক বাস্তবজীবনে দৃঢ়বদ্ধ রীতিনিয়ম অনুসৃত যে হইত না তাহার প্রমাণ অসংখ্য লিপি ও সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। পাল-চন্দ্র এবং সেন-বর্মণ আমলে যথেষ্ট ব্রাহ্মণ রাজা, সামন্ত, মন্ত্রী, ধর্মাধ্যক্ষ, সৈন্য-সেনাপতি, রাজকর্মচারী, কৃষিজীবি ইত্যাদির বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন; অম্বষ্ঠ-বৈদ্যেরা

মন্ত্রী হইতেছেন; দাসজীবিরা রাজকর্মচারী সভাকবি ইত্যাদি হইতেছেন; করণ-কায়স্থেরা সৈনিকবৃত্তি চিকিৎসাবৃত্তি ইত্যাদি অনুসরণ করিতেছেন; কৈবর্তরা রাজকর্মচারী ও রাজ্যশাসক হইতেছেন; এধরণের দৃষ্টান্ত অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অনবরতই পাওয়া যাইতেছে।

পাল-রাষ্ট্রযন্ত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় রাষ্ট্র ও সমাজপদ্ধতির পূর্বোক্ত রীতিক্রম সুস্পষ্ট ও সক্রিয়। প্রথমেই দেখিতেছি, রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ও আধিপত্য বাড়িয়াছে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীদর্ভপাণি, পৌত্র কেদারমিশ্র ও প্রপৌত্র গুরবমিশ্র রাজা ধর্মপালের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর চারিজন পালসম্রাটের অধীনে পালরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন বেদবিদ্ পরমশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ রাজনীতিকুশল। আর একটি ব্রাহ্মণ পরিবার—শাস্ত্রবিদ্‌শ্রেষ্ঠ যোগদেব, পুত্র তত্ত্বোবোধভূ বোধিদেব এবং তৎপুত্র বৈদ্যদেব—এই তিনজন যথাক্রমে তৃতীয় বিগ্রহপাল, রামপাল এবং কুমারপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই পরিবারও পাণ্ডিত্যে, শাস্ত্রজ্ঞানে—এক কথায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে যেমন কুশলী ছিলেন তেমনই ছিলেন রাজনীতি ও রণনীতিতে। নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপির দূতক ভট্ট গুরব ব্রাহ্মণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। প্রথম মহীপালের বাণগড়লিপির দূতক ছিলেন ভট্ট শ্রীবামন মন্ত্রী, ইনিও অন্যতম প্রধান রাজপুরুষ সন্দেহ নাই। এই রাজার রাজগুরু ছিলেন শ্রীবামরাশি; ইনি বোধ হয় একজন শৈব সন্ন্যাসী ছিলেন। বৌদ্ধরাজার লিপি "ওঁ নমো বুদ্ধায়" বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু প্রথম দুই শ্লোকেই বলা হইতেছে, "সরসীসদৃশ-বারানসীধামে, চরণাবনত-নৃপতিমস্তকাবস্থিত কেশপাশ সংস্পর্শে শৈবালাকীর্ণ-

রূপে প্রতিভাত শ্রীবামরাশি নামক গুরুদেবের পাদপদ্মের আরাধনা করিয়া, গৌড়াধিপ মহীপাল [যাঁহাদিগের দ্বারা] ঈশান-চিত্রঘণ্টাদি শতকীর্তিরত্ন নির্মাণ করাইয়াছিলেন…"। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন "চিত্রঘণ্টেশী" নবদুর্গার একতম রূপ; কাজেই, ঈশান চিত্রঘণ্টাদি অর্থে নবদুর্গার বিভিন্ন রূপ সূচিত হইয়া থাকা অসম্ভব নয়। শ্রীবামরাশি নামটিও হঠাৎ শৈব বা শাক্ত লক্ষণের সূচক।

একটি ক্ষত্রিয়বর্ণ প্রধান রাজপুরুষের নাম বোধ হয় পাওয়া যাইতেছে ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে; ইনি মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মা। এই সামন্ত নরপতিটি যেন অবাঙালী বলিয়াই মনে হইতেছে। কিছু কিছু বণিকের নাম পাইতেছি, যেমন বণিক লোকদত্ত, বণিক বুদ্ধমিত্র; নামাংশ বা পদবী দেখিয়া মনে হয় ইহারা পরবর্তীকালের 'ভদ্র' সংকরবর্ণীয়, বৃত্তি অবশ্যই বৈশ্যের; কিন্তু রাষ্ট্রে বর্ণ হিসাবে বা শ্রেণী হিসাবে ইহাদের কোনও প্রাধান্য নাই। করণ-কায়স্থদের প্রভাব ব্রাহ্মণদের প্রভাবের সঙ্গে তুলনীয় না হইলেও খুব কম ছিল না। রামচরিত-রচয়িতা সন্ধ্যাকরনন্দীর পিতা প্রজাপতিনন্দী ছিলেন করণদের মধ্যে অগ্রণী এবং রামপালের কালে পালরাষ্ট্রের সান্ধিবিগ্রহিক। আর এক করণ-শ্রেষ্ঠ শব্দপ্রদীপ গ্রন্থের রচয়িতা; তিনি স্বয়ং তাঁহার পিতা ও পিতামহ সকলেই ছিলেন রাজবৈদ্য; দুইজন পালরাজসভার, একজন চন্দ্ররাজসভার। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে ধর্মাধিকারপদাভিষিক্ত জনৈক শ্রীগোনন্দন এবং মদনপালের মনহলিলিপিতে সান্ধিবিগ্রহিক দূতক জনৈক ভীমদেবের সংবাদ পাইতেছি—ইহারাও করণ-কায়স্থকুলসম্ভূত বলিয়া মনে হইতেছে। কৈবর্ত দিব্য বিদ্রোহী হইবার আগে পালরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান রাজপুরুষ বা সামন্ত ছিলেন, সে কথা ত আগেই একাধিকবার বলা

হইয়াছে। সামন্ত নরপতিদের মধ্যেও করণ-কায়স্থদের দর্শন মিলিতেছে। ত্রিপুরা পট্টোলির মহারাজা লোকনাথ নিজেই ছিলেন করণ। কিন্তু করণদের প্রভাব পালরাষ্ট্রে যতই থাকুক, ঠিক আগেকার পর্বের মত আর নাই; পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের রাষ্ট্রে সর্বত্রই যেন ছিল করণ-কায়স্থদের প্রভাব, অন্ততঃ নামাংশ বা পদবী হইতে তাহাই মনে হয়। পালচন্দ্রপর্বে ঠিক ততটা প্রভাব নাই; পরিবর্তে ব্রাহ্মণ প্রভাব বর্ধমান।

কম্বোজ-সেন-বর্মণ পর্বের রাষ্ট্রে এই ব্রাহ্মণ প্রভাব ক্রমশঃ বাড়িয়াই গিয়াছে। ভবদেবভট্ট ও হলায়ুধের বংশের কথা পূর্বেই একাধিক-বার উল্লেখ করিয়াছি; এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একাধিক পুরুষ ব্যাপিয়া সেন-বর্মন রাষ্ট্রে এই দুই পরিবারের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাহা ছাড়া অনিরুদ্ধভট্টের মত ব্রাহ্মণ-রাজগুরুদের প্রভাবও রাষ্ট্রে কিছু কম ছিল না। অধিকন্তু, পুরোহিত, মহাপুরোহিত, শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারাধিকৃত, শান্তি-বারিক, তন্ত্রাধিকৃত, রাজপণ্ডিত প্রভৃতিরও প্রভাব এই পর্বের রাষ্ট্রগুলিতে সুপ্রচুর; এবং ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রভাবের পরিচয় বিশেষভাবে কিছু পাওয়া যাইতেছে না; বরং বল্লালচরিত কাহিনী এবং বৃহদ্ধর্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বর্ণতালিকা হইতে মনে হয় শিল্পী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীভুক্ত অনেক বর্ণ রাষ্ট্রের অকৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া সমাজে নামিয়া গিয়াছিল। বণিক-ব্যবসায়ীদের প্রতি সেনরাষ্ট্র বোধ হয় খুব প্রসন্ন ছিল না। একমাত্র বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে বারেন্দ্রক-শিল্পীগোষ্ঠীচূড়ামণি শূলপাণিকে পাইতেছি বণিক সামন্তরূপে। বৈদ্যদের প্রভাব-পরিচয়ের অন্ততঃ একটি দৃষ্টান্ত আমাদের জানা আছে; বৈদ্যবংশ-

প্রদীপ বনমালী কর রাজা ঈশানদেবের পট্টনিক বা মন্ত্রী ছিলেন; কিন্তু সংবাদটি বঙ্গের পূর্বতম অঞ্চল শ্রীহট্ট হইতে পাওয়া যাইতেছে। একই অঞ্চলে দেখিতেছি দাস-কৃষিজীবিরা রাজকর্মচারী এবং সভাকবিও হইতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের পরেই রাষ্ট্রে যাঁহাদের প্রভাব সক্রিয় ছিল তাঁহারা করণ-কায়স্থ; ইহাদের প্রভাব হিন্দু আমলে কখনও একেবারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; করণ-কায়স্থদের বর্ণগত বৃত্তিই বোধ হয় তাহার কারণ। সেনরাজসভার সভাকবিদের মধ্যে অন্ততঃ একজন করণ-কায়স্থ উপবর্ণের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়; তিনি উমাপতিধর। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, উমাপতি লক্ষ্মণসেনেব অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের সংকলয়িতা কবি শ্রীধরদাসও বোধ হয় করণ-কায়স্থ ছিলেন; শ্রীধর নিজে ছিলেন মহামাণ্ডলিক, তাঁহার পিতা বটুদাস ছিলেন মহাসামন্তচূড়ামণি। বিজয়সেনের বারাকপুব লিপির দূত শালাড্ডনাগ, বল্লালসেনের সান্ধিবিগ্রহিক হরিঘোষ, লক্ষ্মণসেনেব মহাসান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত, এই রাজারই অন্যতম প্রধান রাজকর্মচারী শঙ্করধর, বিশ্বরূপসেনের সান্ধিবিগ্রহিক নাঞ্ৰী সিংহ এবং কোপি বিষ্ণু, ইত্যাদি সকলকেই কবণ-কায়স্থ বলিয়াই মনে হইতেছে। লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি ধোয়ী কিন্তু ছিলেন জাতে তন্তুবায়; তন্তুবায়-কুবিন্দকেরা উত্তম-সংকর বা সৎশূদ্র পর্যায়ের লোক, একথা স্মরণীয়।

রাষ্ট্রে বিভিন্ন বর্ণেব প্রভাবের মোটামুটি যে পরিচয় পাওয়া গেল তাহা হইতে অনুমান হয়, ব্রাহ্মণ ও করণ-কায়স্থদেব প্রভাব-প্রতিপত্তিই সকলের চেয়ে বেশী ছিল। করণ-কায়স্থদের প্রভাবের কারণ সহজেই অনুমেয়; ভূমির মাপ-প্রমাপ, হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, পুস্তপাল

দপ্তর ইত্যাদির রক্ষণ, লেখকের কাজ ইত্যাদিই ছিল ইঁহাদের বৃত্তি ; স্বভাবতই তাঁহারা রাষ্ট্রে এই বৃত্তিপালনের যতটা সুযোগ পাইতেন অন্যত্র তাহা সম্ভব হইত না। কাজেই এক্ষেত্রে বর্ণ ও শ্রেণী প্রায় সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে তাহা বলা চলে না ; ইঁহারা বৃত্তিসীমা অতিক্রম করিয়াই মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ, ধর্মাধ্যক্ষ, সান্ধিবিগ্রহিক ইত্যাদি পদ অধিকার করিয়াছিলেন। রাজগুরু, রাজপণ্ডিত, পুরোহিত, শান্ত্যাগারিক ইত্যাদিরা অবশ্যই নিজেদের বৃত্তিসীমা রক্ষা করিয়া চলিতেন বলা যাইতে পারে। কোন্ সামাজিক রীতিক্রমানুযায়ী ব্রাহ্মণেরা রাষ্ট্রে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন তাহা ত আগেই বলিয়াছি। বৈশ্যবৃত্তিধারী বর্ণউপবর্ণ সম্বন্ধে বলা যায়, যতদিন শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যেব অবস্থা উন্নত ছিল, ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় ছিল শিল্প বাণিজ্য, ততদিন রাষ্ট্রেও তাহাদেব প্রভাব অনস্বীকার্য ছিল, কিন্তু একাধিক প্রসঙ্গে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, অষ্টম শতকের পরে ব্যবসা বাণিজ্যেব প্রসার কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেও বৈশ্যবৃত্তিধারী লোকদেব প্রভাব কমিয়া যাইতে থাকে। পালরাষ্ট্রেই তাহার চিহ্ন সুস্পষ্ট। বল্লালচরিত কাহিনীর ইঙ্গিত সত্য হইলে সেনরাষ্ট্র তাঁহাদের প্রতি সক্রিয়ভাবে অপ্রসন্নই ছিল। তাহা ছাড়া বৃহদ্ধর্ম-ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণও সে-ইঙ্গিত সমর্থন করে। রাষ্ট্রে ইঁহাদের প্রভাব থাকিলে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে ইঁহারা এতটা অবজ্ঞাত অবহেলিত হইতে পারিতেন না।

যাহা হউক, এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে ব্রাহ্মণ ও করণ-কায়স্থদের প্রভাবই রাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা বেশী কার্যকরী ছিল। অম্বষ্ঠ-বৈদ্যদের প্রভাবও হয়ত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ছিল, কিন্তু সর্বত্র সমভাবে ছিল এবং খুব সক্রিয় ছিল এমন মনে হয় না। বৈশ্যবৃত্তিধারী বর্ণের লোকেবা

রাষ্ট্রে অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রভাবশালীই ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাদের প্রভাব কমিয়া যায় এবং তাঁহাদের কোনও কোনও সম্প্রদায় সৎ-শূদ্রপর্যায় হইতেও পতিত হইয়া পড়েন। কৈবর্তদের একটি সম্প্রদায় কিছুদিন রাষ্ট্রে খুব প্রভাবশালীই ছিলেন, এবং পরেও সে-প্রভাব খুব সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। আর কোন বর্ণের কোনও প্রভাব রাষ্ট্রে ছিল বলিয়া মনে হয় না।